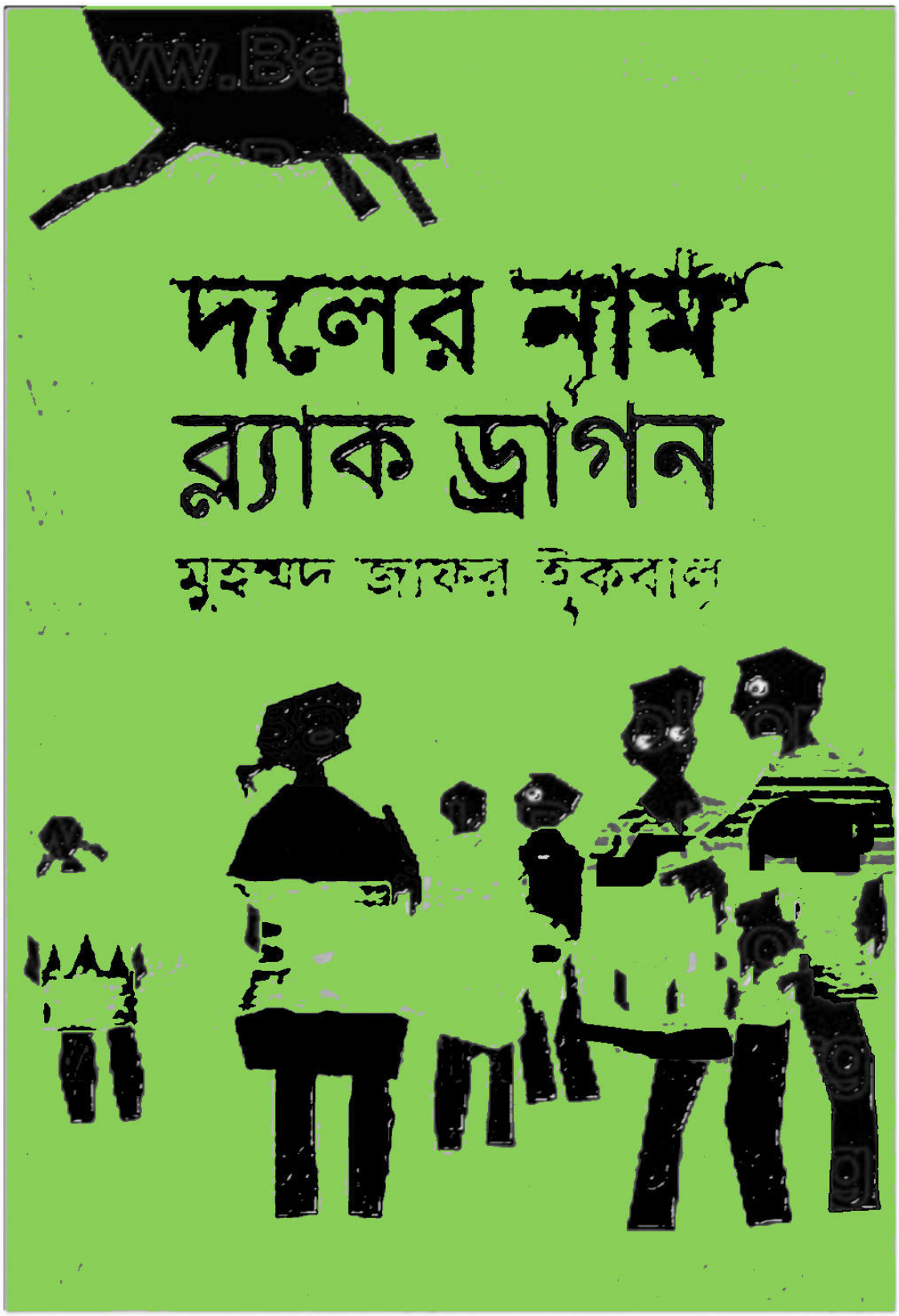
দলের নাম
ব্ল্যাক ড্রাগন
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ব্ল্যাক ড্রাগন

ভয়ঙ্কর দুষ্টু টিটন, ধীর-স্থির বৈজ্ঞানিক চঞ্চল আর মোটকা সাহিত্যিক অণুকে মিলে রাতুলদের দল। ছুটির দিনগুলো আনন্দে আর অ্যাডভেঞ্চারে কাটানোর জন্য তারা একটা ক্লাব বানাল, নাম ব্ল্যাক ড্রাগন। চার ছেলের সঙ্গে এসে জুটল দুটো মেয়ে, রাতুলের বোন মিথিলা (সারাক্ষণ নাকি সুরে আম্মুকে ভাইয়ের নামে নালিশ করে) আর পাড়ায় নতুন আসা টুনি (যার চোখের দৃষ্টি বরফের মত ঠাণ্ডা)। ব্ল্যাক ড্রাগন ক্লাবের আস্তানার জন্যে তারা হাজির হল পোড়া বাড়ি মিশকাত মঞ্জিলে।

সেখানে শুরু হল এক ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চার, সাপখোপ, ভূত-প্রেতের ভয় তার সাথে আছে ভয়াবহ ক্রিমিনাল। বিপদের ওপরে বিপদ। ওরা যখন ভিতরে তখন বাইরে কাজ চলছে ভবনটা ভেঙে ফেলার, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে আসার সকল পথ। এখন উপায়?

মুহম্মদ জাফর ইকবালের এই রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের আরেকটা মজা কিন্তু হাস্যরসে। পাতায় পাতায় পাঠককে খিলখিল করে হেসে উঠতে হবেই। আর ভয়ে গায়ের রোম খাড়াও হয়ে যাবে কখনও কখনও।

উ ৎ স র্গ

আরশাদ ও নোভা
দেশের জন্যে ভালোবাসায়
দেশে ফিরে এসেছ। দেখবে দেশ
তোমাদের ভালোবাসাটুকুকে কত শত গুনে
ফিরিয়ে দেবে!

১.

যেদিন আমাদের স্কুল ছুটি শুরু হয়েছে সেদিন সকালবেলাতেই আমি আর টিটন আমাদের পেয়ারা গাছটাতে উঠে বসেছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল স্কুল ছুটি হয়েছে বলে আমাদের ফাটাফাটি আনন্দ শুরু হয়ে যাবে আর সেটা কীভাবে শুরু হয় সেটা দেখার জন্যে এতো সকালে আমরা পেয়ারা গাছে উঠে বসে আছি।

বড় মানুষেরা এই জিনিসগুলো একেবারেই বুঝতে পারে না। আমি যখন সকালবেলা বাসা থেকে বের হচ্ছি তখন আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "রাতুল এতো সকালে কই যাচ্ছিস?"

আমি বললাম, "কোথাও না।"

"কোথাও না মানে? এইযে বের হচ্ছিস। বের হয়ে কোথায় যাবি?"

আমি বললাম, "এই তো!"

"এই তো মানে?"

"এই তো মানে পেয়ারা গাছে।"

"পেয়ারা গাছে?" মনে হলো শুনে আম্মু খুবই অবাক হলেন, কিন্তু এতো অবাক হবার কী আছে আমি বুঝতে পারলাম না। সকালবেলা মানুষ কী পেয়ারা গাছে উঠে বসতে পারে না?

পাশেই মিথিলা দাঁড়িয়ে ছিল সে তখন নাঁকী সুরে নালিশ করতে শুরু করল, "জাঁন, আঁম্মু, ভাঁইয়া নাঁ পেঁয়ারা গাঁছের ডাঁলে পাঁ দিঁয়ে উল্টা হঁয়ে ঝুঁলে থাঁকে। গাঁছের উঁপরে টিঁটন ভাঁইয়ার সাঁথে মাঁরামাঁরি কঁরে। আঁমি গেঁলে আঁমার মাঁথার উঁপর বিঁষ পিঁপড়া ছেঁড়ে দেঁয়।"

আমি বললাম, "এই মিথিলা ওল্টাপাল্টা কথা বলবি না। ভালো হবে না কিন্তু খবরদার।"

তখন মিথিলা নাকী সুরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, "আঁম্মু দেঁখো ভাঁইয়া

আঁমাকে গাঁলি দিঁচ্ছে।"

আম্মু আমাকে কী কী যেন বললেন, সেই কথাগুলো আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে গেল। আমি হুঁ হ্যাঁ করে মাথা নাড়তে নাড়তে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। ছোট বোনদের যন্ত্রণায় পৃথিবীর কতো ভাইদের জীবন যে বরবাদ হয়ে গেছে কে জানে!

পেয়ারা গাছে বসে বসে আমি আর টিটন দুইটা কষা পেয়ারা খেয়ে ফেললাম। গাছ ভর্তি ছোট ছোট পেয়ারা, আমাদের কারণে কোনোদিন কোনো পেয়ারা বড় হতে পারে না। আরো একটা খাব কী না ভাবছিলাম তখন টিটন চিড়িক করে নড়ে উঠে বলল, "আউ!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

টিটন বলল, "বদমাইশ পাজী পিঁপড়ার বাচ্চা পিঁপড়া–" তারপর প্যান্টের ভিতরে যেখানে স্বাভাবিকভাবে কোনো পিঁপড়া যাবার কথা না– সেখান থেকে একটা পিঁপড়া ধরে বের করে নিয়ে আসে। মুখ খিঁচিয়ে বলে "এই পিঁপড়াটার আমি বোঝাব মজা! কতো বড় সাহস–আমাকে কামড় দেয়? এটাকে আজকে আমি জন্মের মতো শিক্ষা দিব।"

একটা পিঁপড়াকে কেমন করে জন্মের মতো শিক্ষা দেয়া হয় আমি নিজেও সেটা দেখতে চাচ্ছিলাম। টিটন দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "এর ছয়টা ঠ্যাং ছিড়ে আমি আলাদা করে দিব। তারপর দেখি সে কী করে। কেমন করে হাঁটে।"

বিষ পিঁপড়ার পা ছেড়ার চেষ্টা করা নেহায়েতই বোকামির কাজ, কারণ তখন সেটা টিটনের বুড়ো আঙুলে আবার কামড়ে ধরল। টিটন বলল, "আউ! আউ!" এবং কিছু বোঝার আগে সেই পিঁপড়া তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমে গাছের ডালে তারপর পাতার আড়ালে গিয়ে অন্য পিঁপড়াদের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে ফেলল। সেটাকে আলাদা করে আর খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। টিটন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দেখেছিস? দেখেছিস বদমাইশ পিঁপড়াটা কী করল?"

আমি বললাম, "টিটন? তোর শেষ পর্যন্ত পিঁপড়ার সাথে মারামারি করতে হবে? দুনিয়ায় তুই এর থেকে বড় কিছু খুঁজে পেলি না?"

টিটন বলল, "আমি মোটেও পিঁপড়ার সাথে মারামারি করছি না।"

"করছিস।"

"করছি না।"

"করছিস।"

তখন টিটন আমার সাথেই একটা মারামারি শুরু করে দিচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় চঞ্চল এসে গাছের নিচে দাঁড়াল তাই শেষ পর্যন্ত মারামারিটা আর শুরু হলো না। চঞ্চল আমাদের আরেকজন বন্ধু, এই পাড়াতেই থাকে। আমরা জানি যে চঞ্চলের নামটা একেবারেই ঠিক হয় নি–তার নাম হওয়া উচিত ছিল "ধীর-স্থির" তার মতো ধীর-স্থির মানুষ আমি জীবনেও দেখি নি, কিন্তু একজনের নাম তো আর ধীর-স্থির হতে পারে না তাই তাকে চঞ্চল এই ভুল নামটা নিয়েই থাকতে হচ্ছে।

চঞ্চল আমাদের ক্লাসের বৈজ্ঞানিক। অংক আর বিজ্ঞানে কেউ তার সমান নম্বর পায় না। আমাদের ক্লাসে অংক আর জ্যামিতি স্যার যখন ভুল-ভাল পড়াতে থাকেন তখন চঞ্চল ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বলে, "হে ইউক্লিড আপনি এদের ক্ষমা করে দেন! প্লীজ ক্ষমা করে দেন! প্লীজ প্লীজ ক্ষমা করে দেন।"

চঞ্চলের পকেটে সব সময় কোনো না কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি থাকে—হয় একটা চুম্বক না হলে একটা লেন্স না হলে কিছু লিটমাস পেপার তা না হলে কয়েলের তার। আমাদের ঘরে আমরা ক্রিকেট প্লেয়ারের ছবি টানিয়ে রাখি চঞ্চল তার ঘরে শুধু বৈজ্ঞানিক আর গণিতবিদদের ছবি টাঙিয়ে রাখে। শুধু যে টানিয়ে রাখে তা না–এমন ভান করে যে এগুলো ছবি না, যেন সত্যি সত্যি আইনস্টাইন না হয় রামানুজন তার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের অসম্মান হবে সেজন্যে ছবিগুলোর সামনে আমাদের কোনো খারাপ কথাও বলতে দেয় না।

চঞ্চল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে তোদের?"

আমি বললাম, "টিটনকে বিষ পিঁপড়া কামড় দিয়েছে আর সেই জন্যে টিটন পিঁপড়ার সাথে মারামারি করছে।"

চঞ্চল বলল, "বিষ পিঁপড়ার বিষ আসলে এক ধরনের এসিড। একটু চুন যদি লাগাতে পারিস এসিড বেস কাটাকাটি হয়ে যাবে।"

সে কী বলল আমি কিংবা টিটন কিছুই বুঝতে পারলাম না–কোনো সময়েই পারি না। টিটন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, "আমার তো আর খেয়ে

দেয়ে কাজ নাই, যে আমি পকেটে চুন নিয়ে ঘুরি!"

আমি চঞ্চলকে বললাম, "আয় উপরে আয়।"

কোনো বড় মানুষ হলে জিজ্ঞেস করত, কেন? গাছের উপরে কেন উঠে বসতে হবে? চঞ্চল বড় মানুষ না তাই সেও কোনো কথা না বলে গাছের উপরে উঠে বসল। আমি বললাম, "কী মজা, স্কুলে যেতে হবে না!"

টিটন বলল, "হ্যাঁ, কী মজা!" তার সবগুলো দাঁত আনন্দে বের হয়ে এলো। টিটন আমাদের থেকে এক ক্লাস নিচে পড়ে। আমরা সব আশেপাশে থাকি তাই কে কোন ক্লাসে পড়ে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না। তাছাড়া টিটন যে এখনো লেখাপড়ার মাঝে আছে সেটাই একটা বিরাট ব্যাপার–তার অনেকদিন আগেই কোনো একটা ডাকাতের দলে যোগ দেয়ার কথা ছিল, না হলে জলদস্যু হওয়ার কথা ছিল। ছোট বলে কেউ তাকে নিবে না সে জন্যে যেতে পারছে না।

চঞ্চল বলল, "স্কুলটা সারা বছরই বন্ধ থাকা উচিত। আমাদের কী কী পড়তে হবে সেগুলো শুধু ই-মেইল করে জানিয়ে দেবে। আমরা পড়ে নেব।"

আমি বললাম, "যাদের ই-মেইল নেই?"

চঞ্চল মুখ শক্ত করে বলল, "যাদের ই-মেইল নেই তাদের লেখাপড়া করার দরকার নেই।"

আমাদের কারোই ই-মেইল নেই তাই আমরা গরম হয়ে উঠলাম। আমি বললাম, "তোকে বলেছে? সবার কী ই-মেইল আছে? নাই!"

"ঠিক আছে ঠিক আছে। যাদের ই-মেইল নাই তাদেরকে সেল ফোনে এসএমএস করে দেবে।"

আমরা সবাই বলি মোবাইল ফোন, চঞ্চল ঢং করে সেটাকে বলে সেল ফোন। টিটন বলল, "যাদের মোবাইল ফোন নাই?"

চঞ্চল বলল, "এখন সবারই বাসায় একটা না একটা সেল ফোন আছে।"

"যদি না থাকে?"

"আছে।"

টিটন গরম হয়ে বলল, "যদি থাকে কিন্তু ব্যবহার করতে না দেয়?"

আমাদের তখন মনে পড়ল টিটন কয়দিন আগে তার বড় বোনের মোবাইল ফোন দিয়ে তাদের ক্লাসের একটা ছেলের কাছে খুব খারাপ একটা

এসএমএস পাঠিয়েছিল। ফোন নম্বরটা ঠিক করে লিখে নাই তাই সেটা ভুল করে চলে গিয়েছিল অন্য একজনের কাছে। সেই অন্য একজন আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ—ডিসি না মন্ত্রী না যেন এমপি। সেই মানুষটা খবর দিল পুলিশকে, পুলিশ খবর দিল র‍্যাবকে, র‍্যাব খবর দিল মিলিটারীকে–সব মিলিয়ে হুলুস্থুল অবস্থা! আরেকটু হলে টিটনের আপুকে ধরে নিয়ে ক্রস ফায়ার করে মেরেই ফেলছিল! অনেক কষ্ট করে সেই ঝামেলাটা মিটেছে আর তার পর থেকে টিটন তার বাসায় কোনো মোবাইল ফোন ধরতে পারে না।

চঞ্চল বলল, ঠিক আছে, "যাদের সেল ফোন নেই তাদের কাছে চিঠি পাঠাবে।"

চঞ্চলের আইডিয়াটা আমাদের খুব পছন্দ হলো। ঘুম থেকে উঠে দেখব একটা চিঠি, সেই চিঠিতে লেখা আছে আজকে অমুক বাংলা কবিতাটা পড়, ইংরেজি বইয়ের অমুক চ্যাপ্টারটা ট্রানস্লেশন কর, অংক বইয়ের অমুক অংকগুলো কর। ব্যস, আমরা তখন ঘরে বসে কিংবা এই পেয়ারা গাছে বসে সেটা করে ফেললাম। কোনো ঝামেলা নেই। টিটন বলল, "গভমেন্টের অনেক টাকা বেঁচে যাবে। মাস্টারদের বেতন দিতে হবে না। বেত কিনতে হবে না।"

আমি বললাম, "বেত মনে হয় গভমেন্টের টাকা দিয়ে কিনে না। স্যার ম্যাডামেরা নিজেদের পকেটের টাকা দিয়ে কিনে।"

"অসম্ভব।" টিটন মুখ শক্ত করে বলল, "স্যার ম্যাডামেরা নিজেদের পকেটের টাকা দিয়ে কোনোদিন কিছু কিনবে না। প্রত্যেক বছর যখন পাঠ্য বই ছাপায় তখন বেতগুলো রেডি করে। তারপর বইয়ের বান্ডিল আর বেতের বান্ডিল স্কুলে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়।"

চঞ্চল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে জানিস?"

টিটন বলল, "না জানার কী আছে? সবাই জানে।"

এই রকম যুক্তির উপর তো আর তর্ক করা যায় না, তাই আমরা আর তর্ক করলাম না। তা ছাড়া টিটনের সাথে আমরা সাধারণত তর্ক করি না। তর্কে সুবিধে করতে না পারলে সে কথা নেই বার্তা নেই একটা ঘুষি মেরে দেয়।

আমরা তিনজন পেয়ারা গাছে পা দুলিয়ে বসে থাকলাম আর আমাদের মনে হতে লাগল সত্যি সত্যি বুঝি স্কুল ছুটির আনন্দটা শুরু হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার তাড়া নেই, কোন ক্লাসে কোন স্যার কোন ম্যাডাম এসে কী পড়া

জিজ্ঞেস করবেন সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। কোন হোমওয়ার্ক ভুল করে (কিংবা ইচ্ছা করে) করা হয় নাই সেটা নিয়েও অশান্তি নেই। ক্লাসে বসে কখন স্কুল ছুটি হবে সেটা নিয়েও সারাক্ষণ উশখুশ করা নেই। আমরা এখন যতক্ষণ খুশি পেয়ারা গাছের উপর বসে থাকতে পারব, তারপর যখন ইচ্ছ তখন গাছ থেকে নেমে রাস্তা ধরে হাঁটতে পারব। পুকুর ঘাটে গিয়ে সার্ট খুলে ঝপাং করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব, পুকুর থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে ঘুরাঘুরি করে শরীরের মাঝেই কাপড় শুকিয়ে বাসায় ফিরে আসতে পারব। কিছু একটা খেয়ে আবার বের হতে পারব, ইচ্ছে হলে সারাদিন একটা টেনিস বল দিয়ে বোম্বার্স্টিক খেলতে পারব। শুধু সন্ধ্যে হলে বাসায় ফিরে আসতে হবে—যদি কোনোভাবে সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরে আসার নিয়মটা না থাকত তাহলে আমাদের আর কিছু চাওয়ার ছিল না!

চঞ্চল বলল, "এই ছুটিটা ভালো করে কাটাতে হবে।"

টিটন আর আমি দুজনেই মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ। খুব ভালো করে কাটাতে হবে।" ছুটিতে আমরা কী কী করব সেটা চিন্তা করে আমাদের মুখে বিশাল একটা হাসি ফুটে উঠল আমরা তখন পা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলাম।

চঞ্চল একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, "ভালো করে কাটানো মানে–"

টিটন বলল, "ফূর্তি ফূর্তি ফূর্তি!"

চঞ্চল বলল, "না মানে ইয়ে–"

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "কীয়ে?"

"এই ধর, মানে আমরা যদি একটা সায়েন্স ক্লাব করি।"

টিটন হাতে কিল দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস! আমাদের একটা ক্লাব করতে হবে। আমরা সবাই হব মেম্বার এবং আমরা মেম্বাররা এই পাড়াটাকে পাহারা দেব। বাইরে থেকে কেউ এলে পিটিয়ে তক্তা করে দেব।"

চঞ্চল ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি পিটাপিটির ক্লাবের কথা বলি নাই। আমি বলেছি সায়েন্স ক্লাব। আমরা সায়েন্স প্রজেক্ট করব। কোনো একটা জিনিস আবিষ্কার করব।"

টিটনকে সায়েন্স নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত মনে হলো না। সে বলল, "ডিটেকটিভ ক্লাব করতে পারি। কেউ মার্ডার হলে আমরা খুঁজে বের করে ফেলব।"

আমি বললাম, "যদি কেউ মার্ডার না হয়?"

টিটন মাথা চুলকে বলল, "তাহলে অন্য কোনো অপরাধ। চুরি, ডাকাতি।"

"সেগুলোও যদি না হয়?"

"তাহলে আমরা নিজেরাই করে ফেলব।"

"ধুর!" আমি বললাম, "তার থেকে আমরা খেলাধুলার ক্লাব করতে পারি। বোম্বাস্টিক না হলে ফুটবল-ক্রিকেট ক্লাব।"

টিটন বলল, "তিনজনে ফুটবল ক্লাব হয় না। কমপক্ষে এগারোজন লাগে।"

"তিনজন দিয়ে শুরু করব, তারপর আস্তে আস্তে বাড়বে।"

চঞ্চল বলল, "সায়েন্স ক্লাব বানালে তিনজন দিয়েই শুরু করা যায়।"

টিটন রেগে গিয়ে বলল, "সায়েন্স ক্লাব একজনকে দিয়েই হয়।"

চঞ্চল গম্ভীর হয়ে বলল, "একজনের কোনো ক্লাব হয় না। ক্লাব মানেই হচ্ছে একজন থেকে বেশি।"

আমি বললাম, "শুধু আমরা তিনজন কে বলেছে? অনু আছে না?"

তখন টিটন আর চঞ্চল মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। অনুও আছে।"

অনুর নামটাও ভুল নাম। অণু পরমাণু মানেই ছোট ছোট বিন্দি বিন্দি জিনিস, কিন্তু আমাদের অনু মোটাসোটা নাদুস-নুদুস গোলগাল। মোটাসোটা মানুষ সব সময় হাসি-খুশি হয় তাই অনুও হাসি-খুশি। চঞ্চল যেরকম আমাদের বৈজ্ঞানিক অনু সেরকম আমাদের কবি। দুনিয়ার যত বই সে পড়ে ফেলেছে। বড়দের জন্য লেখা অসভ্য অসভ্য বই, যেগুলো আমাদের হাতে নেওয়া মানা অনু সেগুলোও পড়ে ফেলেছে। তাদের বাসা ভর্তি বই, সবাই সারাক্ষণ বসে বসে বই পড়ে। টিটন বলেছে একদিন সে নাকি অনুদের বাসায় গিয়েছে তখন সে দেখে অনুদের বাসার একটা বিড়াল একটা খোলা বইয়ের সামনে বসে বসে বই পড়ছে। টিটনের বেশিরভাগ কথা আমরা অবিশ্যি বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই কথাটা সত্যি হতেও পারে। অনুদের বাসার বিড়াল বই পড়লে অবাক হবার কিছুই নেই।

চঞ্চল বলল, "আজকে ছুটির দিনে অনু ঘরের ভিতরে বসে বসে কী করছে? বের হয় না কেন?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই রাত দুইটা পর্যন্ত বই পড়ে এখন ঘুমিয়ে

আছে।"

"চল গিয়ে ডেকে তুলি।"

"চল।" বলে আমরা গাছ থেকে নামতে শুরু করলাম। সাধারণত আমরা কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি না, কিন্তু অনুদের বাসার কথা আলাদা। তাদের বাসাটা অন্যরকম, আমরা গেলে মনেই হয় না আমরা অন্য কারো বাসায় গেছি। বাসার সবগুলো মানুষ হাসি খুশি সবচেয়ে বড় কথা অনু যে নাদুস-নুদুস মোটাসোটা তার একটা কারণ আছে। এমনি এমনি কেউ নাদুস-নাদুস মোটাসোটা হয় না–সেটা হবার জন্যে ভালো-মন্দ খেতে হয়। অনুদের বাসায় খাওয়া-দাওয়া খুবই ভালো। আমরা যখনই যাই তখনই দেখি তারা মজার মজার খাবার খাচ্ছে। আমাদেরকে ডাকাডাকি করে বসিয়ে দেয় আর আমরাও গাপুস-গুপুস করে খাই। টিটন যে অনুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার কথা বলেছে সেটা শুধু অনুর সাথে কথা বলার জন্যে না, অনুর আম্মু যে সব মজার মজার নাস্তা তৈরি করে রেখেছেন আর আমরা গেলেই যেগুলো আদর-যত্ন করে খাওয়াবেন সেটার জন্যেও। আমার মনে হয় সেইটাই আসল কারণ।

আমরা হেঁটে হেঁটে যেতে থাকি। পাশাপাশি অনেকগুলো বাসা–অনুদের বাসা একটু দূরে, সামনে একটা খোলা মাঠ, আমরা মাঠের মাঝখান দিয়ে যখন শর্টকাট মারছি তখন মিঠুদের বাসাটা চোখে পড়ল। মিঠু ছিল আমাদের প্রাণের বন্ধু, তিন মাস আগে তার আব্বু বদলি হয়ে কক্সবাজার চলে গেছেন। যাবার সময় মিঠু রীতিমতো আমাদের ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। কক্সবাজার পৌঁছে আমাদের বিশাল লম্বা একটা চিঠি দিয়েছে, তার মাঝে সমুদ্রের নানারকম বর্ণনা। আমাদের ছেড়ে একা একা থাকতে তার কত কষ্ট হয়েছে সেটাও লিখেছে। আমরা ভাবলাম চিঠির একটা লম্বা উত্তর দিব। টিটন বলল, তার চাইতে টেলিফোনে কথা বলি। চঞ্চল বলল, সবচেয়ে ভালো হয় ই-মেইল পাঠালে। লাভের মাঝে লাভ হলো কোনোটাই করা হলো না। এখন আমরা তার ঠিকানাও হারিয়ে ফেলেছি, টেলিফোন নম্বরও জানি না। বেচারা মিঠু নিশ্চয়ই ভাবছে আমরা তাকে ভুলে গেছি, আসলে মোটেও ভুলিনি, যতবার এই মাঠের মাঝখান দিয়ে শর্টকাট মারি আর মিঠুদের বাসাটা চোখে পড়ে ততবার তার কথা মনে পড়ে আর আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

অনুদের বাসায় গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতেই অনুর আম্মু দরজা খুলে দিলেন। আমাদের দেখে হাসি হাসি মুখে বললেন, "কী খবর, ত্রিরত্ন? চতুর্থ রত্নের খোঁজে?"

ঠিক কী বললে ভালো হবে বুঝতে পারলাম না বলে হাসি হাসি মুখ করে বললাম, "না মানে ইয়ে, অনু এখনো বের হচ্ছে না তাই ভাবলাম–"

"আর আমার কাছে অনুর কথা বল না! তাকে ধাক্কাধাক্কি করেও তোলা যায় না! যাও দেখি, চেষ্টা করে দেখ ঘুম থেকে তুলতে পার কী না!"

টিটন বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না খালাম্মা, আমরা এক্ষুণি তুলে দেব।"

চঞ্চল বলল, "আমার ইনডাকশন কয়েলটা নিয়ে আসা উচিত ছিল! পায়ের আঙুলে বেঁধে একটা শক দিতাম, চিড়িক করে লাফ দিয়ে উঠত।"

আমি বললাম, "ইনডাকশন কয়েল ফয়েল লাগবে না, আমরা ধাক্কাধাক্কি করে তুলে ফেলব।"

কাজটা অবিশ্যি এতো সহজ হলো না। আমরা তার ঘরে গিয়ে অনুকে ধাক্কাধাক্কি করলাম, অনু আঁ উঁ করে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তখন আমরা শেষ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে অনুকে বিছানা থেকে ফেলে দিলাম, ধড়াস করে বিছানা থেকে নিচে পড়ে শেষ পর্যন্ত সে চোখ পিটপিট করে বলল, "ও ! তোরা।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমরা। এখনো ঘুমাচ্ছিস? আজ থেকে স্কুল ছুটি জানিস না?"

অনু ঘুম ঘুম গলায় বলল, "সেই জন্যেই তো ঘুমাচ্ছি।"

"ছুটির সময়টা ঘুমিয়ে নষ্ট করবি নাকী গাধা কোথাকার?

"তাহলে কী করব?"

আমি বললাম, "আমরা একটা ক্লাব করব ঠিক করেছি।"

"ক্লাব?" অনু চোখ বড় বড় করে বলল, "সাহিত্য ক্লাব? সবার কাছ থেকে গল্প, কবিতা নিয়ে দেয়াল পত্রিকা বের করব?"

চঞ্চল বলল, "কীসের ক্লাব সেইটা এখনো ঠিক হয় নাই। সায়েন্স ক্লাবও হতে পারে–"

টিটন বলল, "ডিটেকটিভ ক্লাবও হতে পারে।"

আমি বললাম, "ফুটবল না হয় ক্রিকেট ক্লাবও হতে পারে।"

সাহিত্য ক্লাবকে বেশি পাত্তা দিলাম না বলে অনুর মনটা একটু খারাপ হলো, তাই আমি তার মন ভালো করার জন্যে বললাম, "আবার সবকিছু মিলিয়েও একটা ক্লাব হতে পারে! যেটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবে আবার ফুটবল খেলবে আবার ডিটেকটিভ কাজ করবে। আমরা এখনো ঠিক করি নাই।"

টিটন বলল, "সেটা ঠিক করার জন্যেই এসেছি। চারজনে মিলে ঠিক করব।"

আমি ধাক্কা দিলে বললাম, "ওঠ। ঘুম থেকে ওঠ।"

অনু এবারে উঠল। হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা খেতে বসল। আমরা তো তাকে আর একা একা বসতে দিতে পারি না, তাই আমরাও বসে গেলাম। ঠিক আমরা যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম অনুর আম্মু মজার মজার নাস্তা নিয়ে এলেন! আমরা যদি এই বাসায় থাকতাম তাহলে আমরাও নির্ঘাত অনুর মতো গোলগাল মোটাসোটা নাদুস-নুদুস হয়ে যেতাম। খেতে খেতে আমরা ক্লাব নিয়ে কথা বলতে থাকি। টিটন বলল, "বুঝলি, ভালো ক্লাব মানে হচ্ছে ভালো একটা নাম। একেবারে ফাটাফাটি একটা নাম। যেমন ধর ব্লাড অ্যান্ড মার্ডার।" নামটা আমাদের কেমন পছন্দ হয়েছে সেটা বোঝার জন্যে টিটন আমাদের সবার মুখের দিকে তাকাল।

চঞ্চল ইতস্তত করে বলল, "ব্লাড অ্যান্ড মার্ডার? কিসের ব্লাড? আর কে মার্ডার করবে? আমরা মার্ডার করব নাকী আমাদের মার্ডার করবে?"

"ধুর গাধা।" টিটন বিরক্ত হয়ে বলল, "কেউ কাউকে মার্ডার করবে না। এটা একটা নাম। যেন নামটা শুনলেই মনে হয় সাংঘাতিক কিছু।"

অণু বলল, "ওহ। ইংরেজি নাম দিবি কেন? আমরা বাঙালি, তাই নামটা হবে বাংলা। আমাদের চারজনের ক্লাব তাই এটার নাম দিতে পারি চতুর্ভুজ। কিংবা চতুষ্কোণ।"

টিটন হই হই করে উঠল, "কক্ষনো না। মনে হচ্ছে জ্যামিতির ক্লাস! আমরা কী অংকের ক্লাব করছি নাকী?"

চঞ্চল গম্ভীর হয়ে বলল, "করলে দোষ আছে? পৃথিবীতে গণিতের ক্লাব নাই? বাংলাদেশে আছে। তারা অলিম্পিয়াডে গিয়ে মেডেল আনে।"

টিটন বলল, "মেডেলের খেতা পুড়ি। আমরা কী মেডেলের জন্য ক্লাব বানাচ্ছি? মোটেই না। চতুর্ভুজ, চতুষ্কোণ—এইসব শুনলেই আমার জ্যামিতির

ক্লাসের কথা মনে হয়। আর জ্যামিতি ক্লাসের কথা মনেই জ্যামিতি স্যারের কথা মনে হয় আর জ্যামিতি স্যারের কথা মনে হলেই স্যারের পিটুনির কথা মনে হয়। কাজেই এই নাম আমরা রাখতে পারব না।" কথা শেষ করে টিটন টেবিলে একটা কিল দিল আর তখন টেবিলের সব প্লেট-পিরিচ ঝনঝন করে উঠল।

টিটনের এতো জোরে কিল দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না। তার যুক্তিটা কিল ছাড়াই আমরা মেনে নিতাম। যে ক্লাবের নাম শুনলেই পিটুনির কথা মনে হয় সেই নাম রাখা ঠিক না। অনু তখন বলল, "তাহলে নাম রাখি অটিরাচ।"

"অটিরাচ?" চঞ্চল বলল, "অটিজম আছে জানি, কিন্তু অটিরাচ আবার কী?"

অনু হাসি হাসি মুখে বলল, "সেটাও বুঝলি না? অনুর অ টিটনের টি রাতুলের রা আর চঞ্চলের চ দিয়ে অটিরাচ!"

আমরা সবাই দুলে দুলে হাসলাম, নামটা ভালোই কিন্তু চঞ্চল আপত্তি করল, বলল, "আমাদের ক্লাবে আমরা কী আর কাউকে নিব না? ধর আরেকজন এলো, তার নাম ঝন্টু তখন ক্লাবের নাম হয়ে যাবে অটিরাচঝ। তারপর আরেকজন, তার নাম শওকত তখন ক্লাবের নাম হবে অটিরাচঝশ–উচ্চারণ করতেই দাঁত ভেঙ্গে যাবে। তারপর যখন ক্লাবের মেম্বার হবে একশজন তখন সেই নাম আর কেউ মনে রাখতে পারবে না!"

চঞ্চলের কথায় যুক্তি আছে তাই অটিরাচ নামটাও বাতিল হয়ে গেল। টিটন তখন নতুন উৎসাহে বলল, "তাহলে নামটা ব্লাড অ্যান্ড মার্ডারই রেখে দিই। একেবারে ফাটাফাটি নাম। কী বলিস?"

চঞ্চল বলল, "উহুঁ, আমার পছন্দের নাম হচ্ছে অয়লার।"

"অয়লার?" টিটন ভুরু কুঁচলে বলল, "মানে তৈলাক্ত? আমাদের ক্লাবের নাম কেন তৈলাক্ত হবে? আমরা কী লোকজনকে তেল দিয়ে বেড়াব না কী?"

চঞ্চল গরম হয়ে বলল, "অয়লার মানে তৈলাক্ত না গাধা। অয়লার হচ্ছেন একজন বিশাল গণিতবিদ।" নামটা উচ্চারণ করতেই চঞ্চলের মুখে একটা গভীর শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা ভাব চলে আসছিল, "খুব কম বয়সে অয়লার অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন–সেই অন্ধ অবস্থাতে গবেষণা করেছেন।"

অনু বলল, "সবাই একটা নাম বলেছে, রাতুল এখনো কোনোটা বলে

নাই। রাতুল তুই একটা নাম বল।"

"আমি?"

"হ্যাঁ।"

"ব্ল্যাক ড্রাগন।"

"ব্ল্যাক ড্রাগন?" চঞ্চল ভুরু কুঁচকে বলল, "ড্রাগন বলে কিছু নাই তুই জানিস? ড্রাগন ফ্লাই আছে। ড্রাগন ফ্লাই মানে হচ্ছে ফড়িং। তুই আমাদের ক্লাবের নাম রাখতে চাস ফড়িং?"

আমি রেগে বললাম, "মোটেও আমি ফড়িং রাখতে চাই না। তাহলে বলতাম ড্রাগন ফ্লাই। আমি কী ড্রাগন ফ্লাই বলেছি? বলি নাই। বলেছি ব্ল্যাক ড্রাগন।"

চঞ্চল মুখটা ভোতা করে বসে রইল। অনু বলল, "নামটার মাঝে কোনো সৌন্দর্য নাই। বাংলা করলে হবে কালা গুইসাপ। কালা গুইসাপ কোনো নাম হলো?"

আমি আরো রেগে উঠলাম, "ড্রাগনের বাংলা মোটেও গুইসাপ না।"

"ড্রাগনের বাংলা তাহলে কী?"

"ড্রাগনের বাংলা ড্রাগন।"

টিটন বলল, "ঝগড়াঝাটি বন্ধ করে আমার নামটা রেখে দে ব্লাড অ্যান্ড মার্ডার।"

আমি বললাম, "তার চাইতে একটা কাজ করা যাক।"

"কী কাজ।"

"আমরা সবাই একটা একটা করে নাম বলি। সেই নামগুলো আলাদা আলাদা কাগজের টুকরায় লিখব। তারপর লটারি করে যার নাম উঠবে সেইটাই হবে ক্লাবের নাম।"

"লটারি?"

"হ্যাঁ। এছাড়া আর উপায় কী? তোরা কী ভাবছিস কোনোদিন আমরা একজনের নামে আরেকজন রাজি হব? হব না।"

চঞ্চল মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা ঠিক।"

অনু ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় মানুষের মতো বলল, "এই জন্যে বাঙালি জাতির উন্নতি হচ্ছে না। আমাদের মাঝে পরমতসহিষ্ণুতা নাই।"

টিটন বলল, "কী নাই?"

"পরমতসহিষ্ণুতা?"

"সেইটা আবার কী জিনিস? জীবনেও এর নাম শুনি নাই।"

"তোর মাঝে এটা নাই সেই জন্যে তুই এর নাম শুনিস নাই।"

আমি বললাম, "জ্ঞানের কথা বাদ দিয়ে একটা কাগজ কলম নিয়ে আয়।" অনু উঠে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে এলো। আমি কাগজটা চার টুকরা করে বললাম, "এখন একজন একজন করে তোদের পছন্দের নামগুলো বল, আমি লিখি।"

টিটন বলল, "ব্লাড অ্যান্ড মার্ডার।"

আমি কাগজে লিখলাম ব্ল্যাক ড্রাগন—একটু আড়াল করে লিখলাম যেন কেউ দেখতে না পায়, তারপর কেউ দেখার আগে কাগজটা ভাঁজ করে ফেললাম।

চঞ্চল বলল, "অয়লার।"

আমি লিখলাম ব্ল্যাক ড্রাগন।

অনু বলল, "সোনালী ডানা"

আমি লিখলাম ব্ল্যাক ড্রাগন।

তারপর আমি নিজেরটা লিখলাম—ব্ল্যাক ড্রাগন। কাগজগুলো ভাঁজ করে টেবিলে রেখে আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "এই লটারিতে আমাদের কোনো একজনের দেওয়া নাম উঠবে। অন্য সবাইকে সেটা মানতে হবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"সবাই একজন আরেকজনের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।"

চঞ্চল বলল, "গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলে কী হয়?"

"জানি না। মনে হয় প্রতিজ্ঞা ভাংলে সে মরে যায়।"

চঞ্চল বাঁকা করে হেসে বলল, "তোকে বলেছে! মরে যাওয়া যেন এতো সোজা!"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "বকর বকর না করে প্রতিজ্ঞা কর।"

আমরা তখন একজন আরেকজনকে ধরলাম আর অনু আমাদের প্রতিজ্ঞা করাল, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা এই লটারির ফলাফল মানিয়া চলিব। লটারিতে যাহাই উঠিবে তাহাই আমাদের ক্লাবের নাম হইবে। এই নাম নিয়া ভবিষ্যতে কেহ কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিব না।"

আমি তখন কাগজের টুকরাগুলো টেবিলে খুব ভালোভাবে ওলট-পালট করে মিশিয়ে দিয়ে বললাম, "এখন একজনকে একটা কাগজ তুলতে হবে। কে তুলবি?"

কেউ কিছু বলার আগেই টিটন বলল, "আমি! আমি!"

"ঠিক আছে। আগে চোখ বন্ধ কর।"

টিটন চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে একটা কাগজ তুলল, আমি বাকি কাগজগুলো সরিয়ে নিলাম। অনু বলল, "খোল।"

টিটন বলল, "ভয় লাগছে। যদি আমারটা না ওঠে?"

অনু বলল, "আমারও ভয় লাগছে, যদি তোরটা ওঠে!"

চঞ্চল বলল, "অনেক হয়েছে এখন খোল।"

টিটন তখন কাঁপা হাতে কাগজের ভাঁজ খুলল, আর আমি কাগজের মাঝে ব্ল্যাক ড্রাগন লেখা দেখে আনন্দে চিৎকার করে লাফাতে লাগলাম। খুশি হবার পুরো অভিনয়টা হলো একেবারে ফাটাফাটি। কেউ কিছু সন্দেহ করল না।

অনু বিরক্ত হয়ে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, অনেক হয়েছে। এখন থাম।"

চঞ্চল ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, কিছু বলল না। টিটন বলল, "আমার লটারির কপালটাই খারাপ। জীবনে কোনো লটারিতে জিতি নাই। রাজি হওয়াটাই ঠিক হয় নাই।"

আমি বললাম, "এসব বলে কোনো লাভ নাই। এখন নাম ঠিক হয়ে গেছে, এই নামটাই সবার মেনে নিতে হবে।"

অনু গজগজ করে বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে।"

টিটন বলল, "আর ক্লাবের পুরো কাজ হবে গোপনে। পৃথিবীর আর কেউ এর কথা জানবে না।"

অনু বলল, "ঠিক আছে। ঠিক আছে।"

আমি বললাম, "তাহলে এখানে বসে আমরা কথা বলছি কেন? সবাই আমাদের কথা শুনে ফেলছে না?"

আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে কথা বলছি, অনুর আম্মু মাঝে মাঝে এদিক-সেদিক দিয়ে হাঁটছেন। অনুর বোন হাঁটছে, তারা নিশ্চয়ই সবাই আমাদের কথাবার্তা সবকিছু শুনছে। অনু মাথা নেড়ে বলল, "কেউ আমাদের

কথা শুনছে না।"

"কেন?"

"বাসায় কেউ আমাদের কোনো পাত্তা দেয় না। কী বলি না বলি কেউ কিছু শুনে না। তোরা নিশ্চিন্ত মনে কথা বলতে পারিস।"

"ধুর! সবাই শুনছে আমাদের কথা।"

"শুনছে না।"

"শুনছে।"

অনু বলল, "ঠিক আছে দশ টাকা বাজি। কেউ শুনছে না।"

আমি রাজি হয়ে গেলাম, বললাম, "ঠিক আছে।"

চঞ্চল বলল, "কিন্তু কেমন করে বুঝব কেউ শুনছে নাকী শুনছে না?"

অনু বলল, "খুব সোজা। তোরা শুধু লক্ষ কর।"

আমরা লক্ষ করলাম, অনুর আপু যখন ডাইনিং টেবিলের কাছে ফ্রিজ থেকে কিছু একটা বের করছে তখন অনু আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, "তোরা সবাই বোতলে করে কেরোসিন নিয়ে আসবি। সাথে ম্যাচ। বোতলের কেরোসিনটা ঢালব ঘরটাতে তারপর আগুন ধরিয়ে দিব। কাছে শুকনো গাছটাতে যখন আগুন লেগে যাবে তখন আর চিন্তা নাই, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে সারারাত।"

অনুর এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা তার আপু শুনল বলে মনে হলো না। নিজের মতো কাজ করতে লাগল। তারপর আবার বসার ঘরে চলে গেল।

অনু বলল, "দেখেছিস?"

অন্যেরা মাথা নাড়ল, বলল, "অনু ঠিকই বলেছে। আমাদের কথা কেউ মন দিয়ে শুনে না!"

অনু হাত পেতে বলল, "আমার দশ টাকা দে।"

আমি অনেক কষ্টে দশটা টাকা জোগাড় করেছিলাম অনুকে দিয়ে দিতে হলো!

বোঝাই যাচ্ছে কেউই আমাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছে না। আমরা আমাদের সবচেয়ে গোপন কথাগুলো এখানে বসেই বলতে পারব কোনো সমস্যা হবে না, তারপরেও আমরা ঠিক করলাম আমাদের বাকি আলাপ আমরা বাসার বাইরে গিয়ে করব।

যখন আমরা বের হয়ে যাচ্ছি অনুর আপু আমাদের বিদায় দিয়ে দরজা

বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গিয়ে অনুকে বলল, "বেশি করে আনতে বলিস।"

অনু অবাক হয়ে বলল, "কী বেশি করে আনতে বলব?"

"কেরোসিন! আগুন লাগানো কিন্তু এতো সোজা না।"

অনু চিৎকার করে বলল, "আপু! তুমি আমাদের কথা শুনছিলে? তাহলে না শোনার ভান করলে কেন?"

অনুর আপু উত্তর না দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে দরজার ফাঁক দিয়ে বললেন, "আমার কিন্তু কালা গুইসাপ নামটাই বেশি পছন্দ!"

এবার শুধু অনু না, আমরাও চিৎকার করে উঠলাম, "আপনি আমাদের সব কথা শুনেছেন!"

"চোখের তো পাতি আছে তাই চোখ বন্ধ রাখা যায়। কানের তো পাতি নাই!" না চাইলেও সব কথা শুনতে হয় বলে অনুর আপু আমার দিকে তাকাল, বলল, "রাতুল! আমি তোমার সাথে জন্মেও কোনোদিন লটারি করব না! বাবারে বাবা!"

কথা শেষ করে অনুর আপু বাম চোখটা দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে চোখ টিপলেন। শুধু আমি দেখলাম, আর কেউ দেখল না। কেন টিপলেন সেটাও শুধু আমি বুঝলাম আর কেউ বুঝল না।

ঘর থেকে বের হয়ে আমি অনুর দিকে হাত পেতে বললাম, "আমার দশ টাকা ফেরত দে।"

অনু বিরস মুখে আমার টাকা ফেরত দিল। আমি বললাম, "এখন তোর আমার বাজির টাকা দেওয়ার কথা ছিল। যা, তোকে মাপ করে দিলাম! দিতে হবে না।"

আমরা যখন মাঠের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখলাম মিঠুদের বাসার সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সেই ট্রাক থেকে মালপত্র নামানো হচ্ছে। আমি বললাম, "মিঠুদের বাসায় নতুন মানুষ এসেছে!"

আমরা খানিকক্ষণ দেখার চেষ্টা করলাম সেখানে আমাদের বয়সী কোনো ছেলেকে দেখা যায় কী না–দেখতে পেলাম না। বিকালবেলা এসে খোঁজ নিতে হবে। আমাদের কপাল সাধারণত ভালো হয় না, আমাদের বয়সী ছেলে পাওয়া যাবে না। যদিও বা পাওয়া যায় তাহলে নির্ঘাত সে হবে চূড়ান্ত পাজী যার তুলনায় টিটনকে মনে হবে ফেরেশতা!

২.

অনুর বাসা থেকে বের হয়ে আমরা চারজন কথা বলতে বলতে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি। চঞ্চল বলল, "বুঝলি, ভালো একটা ক্লাব মানে হচ্ছে ভালো একটা আস্তানা।"

টিটন বলল, "ঠিক বলেছিস।"

অনু বলল, "নামটা যখন ভালো হলো না, তখন আস্তানটা খুব ভালো হওয়া দরকার।"

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "কী বললি? নামটা ভালো হয় নাই?"

"হয় নাই তো। কালা গুইসাপ একটা নাম হলো?"

"মোটেও নাম কালা গুইসাপ না, নাম হচ্ছে ব্ল্যাক ড্রাগন!"

ঐ একই কথা। ইংরেজিতে ব্ল্যাক ড্রাগন বাংলায় কালা গুইসাপ।"

আমি রেগেমেগে বললাম, "বাংলায় মোটেও কালো গুইসাপ না।"

"তাহলে বাংলায় কী?"

"এটা একটা নাম। নামের আবার বাংলা ইংরেজি আছে? রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে কী তুই নবাব বাঙ্গাল বাঘ বলিস?"

আমার কথা শুনে চঞ্চল হি হি করে হাসতে লাগল। বলল, "নবাব বাঙ্গাল বাঘ! এই নাম শুনলে সুন্দরবনের সব রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুইসাইড করবে!"

টিটন বলল, "ঐসব ছেড়ে এখন বল আমাদের ক্লাবের আস্তানাটা কোথায় হবে। গোপন আস্তানা হতে হবে, কেউ যেন জানতে না পারে।"

চঞ্চল বলল, "আমাদের বাসার দোতলায় হতে পারে। আমি যে ঘরটা ল্যাবরেটরি বানিয়েছি তার পাশের ঘরটা খালি আছে।"

আমি বললাম, "উহুঁ। কারো বাসায় বানানো যাবে না। তাহলে সবাই জেনে যাবে।"

"তাহলে কোথায় বানাবি?"

চঞ্চল বলল, "একটা ট্রি হাউজ বানালে কেমন হয়?"

"ট্রি হাউজ?"

"হ্যাঁ। গাছের উপরে একটা গোপন আস্তানা।"

"কোন গাছে?"

"একটা গাছ খুঁজে বের করতে হবে। বড় একটা গাছ।"

অনু বলল, "মিশকাত মঞ্জিলে বড় বড় গাছ আছে।"

"মিশকাত মঞ্জিল!" আমাদের সবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

মিশকাত মঞ্জিল শুনে চোখ বড় বড় হওয়ার কারণ আছে। আমাদের পাড়া থেকে নদীর দিকে কিছুদূর হেঁটে গেলে দেয়াল ঘেরা যে বিশাল জায়গাটা আছে তার ভেতরে মিশকাত মঞ্জিল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভেতরে একটা বড় দালান আছে, গাছপালা ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা তাই পুরানো দালানটা দেখাও যায় না। এক সময় সেখানে মানুষজন থাকত, আজকাল কেউ থাকে না। কেন থাকে না সেটা নিয়ে নানা রকম গল্প চালু আছে। সবচেয়ে বেশি চালু গল্পটা হচ্ছে এরকম: এই বাড়ির মালিক মিশকাত খান খুবই অত্যাচারী ধরনের মানুষ ছিল, তার নাকী ডাকাতের দল ছিল। মিশকাত খানের বাসায় ছোট একটা বাচ্চা মেয়ে কাজ করত। একদিন হঠাৎ করে সেই ছোট মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েটার বাবা নেই, মা খোঁজ পেয়ে এসেছে মিশকাত খানের সাথে দেখা করতে। মিশকাত খান মা'কে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। বাচ্চা মেয়েটির মা তখন মিশকাত মঞ্জিলের বাইরে দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে তুলে খোদার কাছে বলেছে, "খোদা যেই মানুষ আমার মাসুম বাচ্চাকে খুন করেছে তুমি তাকে নির্বংশ করে দাও। আমার আদরের ধনকে যে নিয়ে গেছে তুমি তার আদরের ধনকে নিয়ে যাও। সে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে তুমি তাকে সেই কষ্ট দাও। তার মুখে পানি দেবার জন্যে যেন কেউ না থাকে। শিয়াল কুকুর যেন তার লাশ টেনে ছিঁড়ে খায়।"

মিশকাত মঞ্জিলের দারোয়ান সেই মাকে বাড়ীর সামনে থেকে তাড়িয়ে দিল। মা কোথায় গেল সেটা আর কেউ জানতে পারল না। কিন্তু তারপর মিশকাত মঞ্জিলে ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার ঘটতে থাকল। সবার আগে মারা গেল মিশকাত খানের ছোট বউ। মিশকাত খান অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়েকে

জোর করে ধরে এনে বিয়ে করেছিল। সেই বউয়ের সারা শরীরে দেখা গেল গুটি বসন্ত। ভুগে ভুগে মারা গেল সে। বসন্ত রোগের ভয়ে তার অনেক কর্মচারী ও কাজের লোক পালিয়ে গেল। ছোট বউ মারা যাবার কিছুদিন পর বড় বউ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেল। তারপর তার ছেলেমেয়েগুলো একজন একজন করে মারা যেতে লাগল। একজন মারা গেল পানিতে ডুবে। একজন মারা গেল পাগলা কুকুরের কামড়ে। একজন মারা গেল আগুনে পুড়ে। একজন মারা গেল বিষ খেয়ে। ঝড়ের রাতে একজন মাথায় বাজ পড়ে মারা গেল। একজন মারা গেল বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে। শেষ জনের লাশ পাওয়া গেল জঙ্গলে, মুখটা কেউ খুবলে খুবলে নিয়ে গেছে, কীভাবে নিয়েছে কেউ জানে না। এই বাড়িতে অন্য যারা ছিল তখন তারাও একজন একজন করে চলে গেল। পুরো বাড়িতে রয়ে গেল শুধু মিশকাত খান একা।

আস্তে আস্তে মিশকাত খানের মাথা খারাপ হয়ে গেল। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, কোটরের মাঝে লাল জ্বলজ্বল চোখ, লম্বা লম্বা নখ। সে একা একা এই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় আর বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলে।

এই এলাকার অনেক মানুষ দেখেছে গভীর রাতে মিশকাত খান তার বাড়ির ছাদের রেলিং ধরে হাঁটছে আর তার পিছু পিছু সাদা কাপড় পরা অনেকগুলো ছায়া মূর্তি হাঁটছে। সবাই ধারণা করে সেগুলো মিশকাত খানের বউ ছেলেমেয়ের প্রেতাত্মা। সেগুলো কোনো কথা বলে না, নিঃশব্দে মিশকাত খানের পিছনে হেঁটে যায়।

আরো যখন রাত গভীর হয় তখন একটা ছোট মেয়ের ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যায়—কখনো কখনো আবার খিলখিল করে রক্ত শীতল করা হাসি।

কাজেই অনু যখন মিশকাত মঞ্জিলের কথা বলল, আমরা সবাই রীতিমতো চমকে উঠলাম। টিটন বলল, "সর্বনাশ! ঐ ভূতের বাড়িতে? আমি ওর মাঝে নাই।"

আমিও মাথা নাড়লাম, বললাম, "মাথা খারাপ? আমাদের জানের মায়া নাই?"

চঞ্চল বলল, "জানের মায়া? তোর জান কে নিতে আসছে?"

"ভূত।"

চঞ্চল বলল, "এই দুপুরবেলা কটকটে রোদের মাঝে তোর ভূতের কথা

বলতে লজ্জা করল না?"

"এখন কটকটে রোদ ঠিক আছে। যখন সন্ধ্যা হবে তখন? যখন রাত হবে তখন? তুই তখন যেতে পারবি মিশকাত মঞ্জিলে?"

চঞ্চল গম্ভীর গলায় বলল, "পারব।"

টিটন বলল, "থাক। এতো সাহসের দরকার নাই।"

"এর মাঝে সাহসের কিছু নাই।" চঞ্চল গম্ভীর গলায় বলল, "ভূত বলে কিছু নাই। যদি থাকত তাহলে এতোদিন ভূতকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে ফেলত। ভূতদের চিড়িয়াখানা থাকত, সেখানে নানা রকম ভূত থাকত। আমরা টিকেট কেটে সেই সব ভূত দেখতে যেতাম।"

আমি বললাম, "বেশি বড় বড় কথা বলবি না। ভূতেরা যদি তোর কথা শুনে তাহলে তোর খবর আছে।"

চঞ্চল বলল, "কেন? কী হবে?"

"তোকে ধরে নিয়ে তাদের চিড়িয়াখানায় আটকে রাখবে। ভূতের বাচ্চারা টিকেট কেটে তোকে দেখতে আসবে!"

আমার কথা শুনে চঞ্চল হি হি করে হাসল যেন আমি খুব একটা মজার কথা বলেছি।

আমরা কথা বলতে বলতে হাঁটতে হাঁটতে কীভাবে কীভাবে জানি মিশকাত মঞ্জিলের কাছেই চলে এসেছি খেয়াল করিনি। ভাঙ্গা গেটটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম, টিটন ভেতরে উঁকি দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বলল, "বাবারে বাবা!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী?"

"কিছু না।"

"তাহলে বাবারে বাবা বললি কেন?"

"ইচ্ছে হয়েছে তাই বলেছি। আমার ইচ্ছে হলে আমি বাবারে বাবা বলল, মা'রে মা বলব, চাচারে চাচা বলব, তোর কী?"

এই হচ্ছে আমাদের টিটন। তার সাথে কথা বলাই মুশকিল! কথায় কোনো ছিরি ছাদ নেই, কোনো যুক্তি নেই।

চঞ্চলও ভাঙ্গা গেটটা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আয় ভেতর ঢুকি।"

টিটন বলল, "তোর মাথা খারাপ হয়েছে?"

"মাথা খারাপের কিছু হয় নাই। চল ভেতরটা কেমন দেখে আসি।"

আমরা কেউ ঢুকতে রাজি হলাম না বলে চঞ্চল একাই রওনা দিল। সেটা প্রমাণ করে আমরা সবাই ভীতুর ডিম তাই আমিও শেষ পর্যন্ত চঞ্চলের সাথে ভেতরে যেতে রাজি হলাম। আমাদের দুজনকে ভেতরে ঢুকতে দেখে অনুও ভেতরে যেতে রাজি হলো তখন টিটনের আর না যেয়ে উপায় থাকল না। এমনিতে অন্য সবকিছুতে টিটনের সাহসের কোনো অভাব নেই কিন্তু ভূতের ব্যাপার হলেই তার এক ফোঁটা সাহস থাকে না।

মিশকাত মঞ্জিলের ভেতরে আমরা কখনো উঁকি দেইনি, আজ ভেতরে ঢুকে আবিষ্কার করলাম সেখানে অনেক জায়গা। বড় বড় গাছ, সেই গাছে পাখি কিচিরমিচির করছে। আসল দালানটি বেশ অদ্ভুত, দেয়ালটি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনো দরজা-জানালা নেই। আমরা চঞ্চলের পিছু পিছু পুরো দালানটার চারদিক দিয়ে একবার ঘুরে এলাম। তখন টিটন বলল, "অনেক দেখা হয়েছে, আয় এখন যাই।"

চঞ্চল বলল, "এসেছি যখন তখন বিল্ডিংয়ের ভেতরটা দেখে যাই।"

টিটন বলল, "ভেতরে? সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী আছে? দেখছিস না এখানে কিছু নাই।"

চঞ্চল একাই বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকে গেল তাই শেষ পর্যন্ত আমরাও তার পিছু পিছু গেলাম। ভেতরে অনেকগুলো ঘর, সব ঘরই ফাঁকা। এক-দুইটা ঘরের দরজা আছে, বহুদিন ব্যবহার করা হয়নি বলে কব্জায় মরচে পড়ে গেছে। খোলার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া যায় সেখানে একটা বারান্দা, গাছের পাতা, জঙ্গল আর খড়কুটা দিয়ে ঢেকে আছে। দেয়ালে শ্যাওলা পড়েছে, এক জায়গায় ইটের ফাটলে একটা বট গাছ। দোতলার ঘরগুলো বেশ বড়। বহুদিন কেউ ব্যবহার করে নি তাই ধুলোবালি, গাছের পাতা, খড়কুটো দিয়ে বোঝাই। পিছনের দিকে একটা অংশের ছাদ ধসে পড়েছে, মনে হয় এদিকে আগুন লেগেছিল তাই সবকিছু পুড়ে গেছে।

চঞ্চল বলল, "এই মিশকাত মঞ্জিলই হতে পারে আমাদের গোপন আস্তানা।"

টিটন বলল, "কক্ষনো না।"

"কেন না?"

"আমরা কী ভূতের বাচ্চা না মানুষের বাচ্চা? ভূতের বাচ্চা হলে ঠিক আছে, মানুষের বাচ্চা হলে ঠিক নাই।"

"দেখছিস না কতো জায়গা খালি পড়ে আছে। বড় বড় গাছগুলোর কোনো একটাতে বানাব ট্রি হাউজ!"

টিটন মুখ শক্ত করে বলল, "আমার ট্রি হাউজের দরকার নাই। খালি জায়গারও দরকার নাই।"

ঠিক তখন হুটোপুটির একটা শব্দ হলো আর হঠাৎ করে দেখলাম ছোটখাটো ছাই রঙের একটা জন্তু কোথা থেকে যেন ছুটে বের হয়ে গেল। আমরা সবাই চমকে উঠলাম, টিটন ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

চঞ্চল বলল, "বেজি!"

টিটন বলল, "এখন বেজি বের হয়েছে। একটু পরে বের হবে শেয়াল। তারপর বের হবে বাঘ।"

বেজিটা যেখান থেকে বের হয়েছে চঞ্চল সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আজব ব্যাপার!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী আজব ব্যাপার?"

"বেজিটা কোথা থেকে এলো? এখানে তো দেয়াল। দেয়ালের ভেতর থেকে বেজি বের হয় কেমন করে?"

টিটন বলল, "মনে হয় ওটা বেজি ছিল না। ওটা ভূত ছিল।"

"ভূতের আর কাজ নাই, বেজি সেজে ঘুরে বেড়াবে!"

চঞ্চল দেয়ালটার কাছে গিয়ে দেয়ালটা পরীক্ষা করল, আমিও তার সাথে পরীক্ষা করলাম। নিচে একটু গর্ত যে গর্তটা দিয়ে বেজিটা বের হয়েছে। আমি বললাম, "এই যে এই ফুটো দিয়ে বের হয়েছে।"

"কিন্তু ফুটোর অন্যদিকে কী আছে? বেজিটা থাকে কোথায়?"

"পাশের ঘরে।"

"তাহলে সে পাশের ঘর দিয়ে পালাল না কেন? এদিক দিয়ে পালাল কেন?"

অনু বলল, "তার কারণ বেজিটা তোর মতো সায়েন্টিস্ট না। সে জানে না তার ওদিক দিয়ে বের হওয়ার কথা। সে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অনুষ্ঠান দেখে নাই।"

"ফাজলেমি করবি না। পশু-পাখির বুদ্ধি তোর থেকে বেশি।"

আমি বললাম, "পাশের ঘরটা দেখলেই বোঝা যাবে কেন সেদিক দিয়ে বের হয় নাই। আয় দেখি।"

আমরা পাশের ঘরে গেলাম, টিটন খুব বিরক্ত হয়ে আমাদের পিছু পিছু এলো, ঘরের দেয়ালটা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম কেন বেজি এদিক দিয়ে বের হয় নি। তার কারণ এদিকের দেয়ালে কোনো ফুটো নেই! টিটন পর্যন্ত অবাক হয়ে বলল, "আজব ব্যাপার!"

আমরা তখন আবার আগের ঘরে গেলাম, ফুটোটা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, ভেতরে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। চঞ্চল বলল, "একটা লাঠি খুব ভালো হলে হতো তাহলে গর্তে ঢুকিয়ে দেখতাম অন্য দিক দিয়ে লাঠিটা বের হয় কীনা।"

ঘরে নানা রকম জঞ্জাল কিন্তু লম্বা লাঠির মতো কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। বাইরে বড় বড় গাছ আছে তার একটা ডাল ভেঙ্গে আনা যায় কিন্তু তার জন্যে আবার বাইরে যেতে হবে। এই মুহূর্তে কেউ বাইরে যেতে চাইছে না। চঞ্চল গম্ভীর হয়ে ঘরের চারদিকে তাকাল তারপর পা দিয়ে এক মাথা থেকে অন্য মাথা মাপল। তারপর বাইরে গিয়ে বারান্দাটা পা দিয়ে মাপল তারপর পাশের ঘরে গিয়ে মাপল। মাপামাপি শেষ হলে বলল, "ভেরি ইন্টারেস্টিং।"

"কী হয়েছে?"

"এখানে একটা গোপন কুঠুরি আছে।"

"গোপন কুঠুরি?"

"হ্যাঁ। দুইটা ঘর পনেরো পনেরো তিরিশ পা। কিন্তু বারান্দা হচ্ছে আটত্রিশ পা। তার মানে দুই ঘরের মাঝখানে আট পা লম্বা একটা ঘর। সেই ঘরের কোনো দরজা নাই।"

অনু বলল, "শুধু বেজির জন্য একটা দরজা!"

চঞ্চল বলল, "সেই জন্যেই তো আমরা এটা আবিষ্কার করতে পারলাম! বেজিটাকে থ্যাংকু দেয়া দরকার।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই ঘরে কী আছে?"

টিটন বলল, "গুপ্তধন!"

অনু বলল, "কিংবা মানুষের কঙ্কাল।"

চঞ্চল বলল, "আমাদের দেখতে হবে।"

"কীভাবে দেখবি?"

টিটন বলল, "শাবল দিয়ে দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।"

চঞ্চল তখন বাড়াবাড়ি গম্ভীর মুখে বলল, "উহুঁ। প্রথমে ভিতরে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা ঢুকিয়ে ভিডিও করে দেখব কী আছে। তারপর ঠিক করব কী করা যায়।"

"তুই ক্যামেরা কোথায় পাবি?"

"জোগাড় করতে হবে।"

আমি বললাম, "দেখলি। আমরা আমাদের ব্ল্যাক ড্রাগন ক্লাবটা মাত্র খুলেছি সাথে সাথেই এডভেঞ্চার। সাথে সাথে গুপ্তধন!"

অনু বলল, "সাথে সাথে বেজি। সাথে সাথে গুইসাপ!"

আমি বললাম, "মোটেও গুইসাপ না। বেজি।"

টিটন বলল, "ভূত!"

"কোথায় ভূত?"

"এই গোপন ঘরটার ভিতরেই মনে হয় আটকা আছে। দেয়ালটা ভাঙতেই হাউমাউ করে বের হবে।"

চঞ্চল বলল, "যদি বের হয় তাহলে সেটা হবে গুপ্তধন থেকেও দামি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফীক চ্যানেলে সেটা কোটি টাকায় বিক্রি করতে পারবি!"

অনু বলল, "যদি ভূতটা ভালো হয় তাহলে তাদেরকে আমাদের ক্লাবের মেম্বারও করে ফেলতে পারি!"

টিটন গরম হয়ে বলল, "খবরদার ভূত নিয়ে ঠাট্টা করবি না।"

৩

বিকেলের দিকে আমরা মিঠুদের বাসার দিকে রওনা দিলাম। মিশকাত মঞ্জিলের গোপন ঘরটার ভিতরে কীভাবে ঢোকা যায় সেটা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। টিটনের বুদ্ধিটাই সহজ, একটা শাবল নিয়ে দেয়ালে ঘা মেরে ইটগুলো ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে যাওয়া। কিন্তু চঞ্চল রাজি হচ্ছে না, সে একেবারে খাঁটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাইরে থেকে আগে ভিতরে উঁকি দিতে চায়, কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বিজ্ঞানের এরকম একটা কেরদানি দেখানোর সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়বে না। আমরাও দেখলাম তার এতো আগ্রহ তাই আর না করলাম না। তাছাড়া আজকে মাত্র আমাদের ছুটি শুরু হয়েছে–প্রথম দিনেই যদি সবকিছু করে ফেলি তাহলে কেমন করে হবে? ছুটির অন্য দিনগুলোর জন্যেও তো কিছু রাখা দরকার।

মিঠুদের বাসায় গিয়ে দেখি সেখানে দাঁড়ানো ট্রাকগুলো নেই। ভেতরে মনে হয় মানুষজন আছে, তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। আমাদের বয়সী ছেলে আছে কী নেই খোঁজটা কেমন করে নেওয়া যায় চিন্তা করছিলাম। টিটন বলল, "এতো ধানাই-পানাই করার কী আছে? গিয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি থাকে ডেকে কথা বলব। যদি না থাকে তাহলে এবাউট টার্ন করে চলে আসব।"

আমরা রাজি হলাম। টিটন বাসার দরজা ধাক্কা দিল, দরজাটা খোলা ইচ্ছে করলে আমরা ভিতরে ঢুকে যেতে পারি। মিঠু যখন ছিল তখন যখন তখন ঢুকে গেছি। এখন ঢোকা উচিত হবে কী না বুঝতে পারলাম না। টিটন বলল, "আয় ঢুকে যাই! আমরা তো আর ডাকাতি করতে যাচ্ছি না।"

টিটনের পিছু পিছু আমরা ঢুকে গেলাম। ঘরের সব জায়গায় ফার্নিচার, বাক্স, মালপত্র ছড়ানো ছিটানো। একজন ভদ্রমহিলা তার মাঝে ছোটাছুটি করছেন। আমাদের ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। টিটন মুখ খুললে একেবারে বেখাপ্পা কোনো একটা কথা বলে ফেলবে সে জন্যে আমি

তাড়াতাড়ি বললাম, "খালাম্মা আমরা এই পাড়ায় থাকি। আপনারা নতুন এসেছেন তাই দেখতে এসেছি।"

"হাউ সুইট। এসো বাবারা–দেখেছ ঘরের অবস্থাটা?"

অনু বলল, "আমাদের বাসাটা সবসময়েই এরকম থাকে।"

"তোমাদেরকে বসতে বলারও জায়গা নেই। কোনো একটা বাক্স-টাক্স খুঁজে তার ওপর বসে পড়।

চঞ্চল বলল, "আমাদের বসতে হবে না খালাম্মা।"

টিটন ধানাই-পানাই ছেড়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো, "খালাম্মা আমরা জানতে চাচ্ছিলাম আপনার আমাদের বয়সী ছেলে-টেলে আছে কী না!"

আমি তাড়াতাড়ি যোগ করলাম, "এই পাড়ায় আমরা একসঙ্গে থাকি খেলাধুলা করি।"

অনু বলল, "দেয়াল পত্রিকা বের করি।" পুরো মিথ্যা কথা কিন্তু আমরা এখন সেটা প্রকাশ করলাম না।

ভদ্রমহিলা খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন, "অবিশ্যিই তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়ে আছে। হাউ সুইট। আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। একজন ছোট একজন তোমাদের বয়সী। এসে থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছে। ঢাকার সব বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে চলে এসেছে তো, তাই মন খারাপ। তোমরা ধরে নিয়ে যাও, তাহলে মন ভালো হয়ে যাবে।"

শুনে আমাদেরও মন ভালো হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা এতো ভালো, ছেলেটাও ভালো হবার কথা।

ভদ্রমহিলা ডাকলেন, "এই টুনি টুটুল দেখে যা, কে এসেছে।"

প্রথমে এলো টুটুল—ছেলে। তাকে দেখেই আমাদের বুক ধড়াস করে উঠল কারণ তার বয়স চার থেকে পাঁচ বছর, তার মানে আমাদের বয়সী যে, সে হচ্ছে মেয়ে! আমরা ছেলের খোঁজে এসেছি মোটেই মেয়ের খোঁজে আসিনি। মেয়েদের নিয়ে আমাদের জীবনে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আছে। আমরা মেয়েদের থেকে একশ হাত দূরে থাকি। আমার বাসায় মিথিলা একা আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছে, সারাক্ষণ আম্মুর কাছে নালিশ। সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান। বাইরের কথা স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম।

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। চোখের দৃষ্টি দিয়ে টিটন বলল, "চল পালাই।"

কিন্তু সত্যি সত্যি তো পালানো যায় না। তাই আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম আর তখন টুনি বের হয়ে এলো। আমাদের বয়সী, শুকনো কিন্তু মনে হয় আমাদের থেকে একটু লম্বা। শ্যামলা, মাথার চুল ছোট করে কাটা। একটা জিনসের প্যান্ট আর ঢলঢলে টি-শার্ট পরে আছে। মেয়েটার কাপড়, চেহারা, সাইজ—যেরকমই হোক তার চোখ দুটি দেখেই আমরা বুঝে গেলাম এই মেয়েটার কারণে আমাদের কপালে দুঃখ আছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, "এই দ্যাখ টুনি, এরা কতো সুইট। নিজেরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ওদের বয়সী ছেলেমেয়ে আছে কী না। আর তুই বলছিলি তোকে জঙ্গলে নিয়ে এসেছি! এখানে কথা বলার কেউ নাই।"

টিটন দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে আমাকে বলল, "ছেলেমেয়ে বলি নাই। শুধু ছেলে বলেছি।" কথাটা অবশ্যি আমি ছাড়া আর কেউ শুনল না।

মেয়েটি আমাদের দিকে আর আমরা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, "যা টুনি, এদের সঙ্গে ঘুরে আয়। সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত, পরিচয় করে আয়।"

মেয়েটা হ্যাঁ না কোনো কথা বলল না, ঘরে ঢুকে পায়ে স্যান্ডেল পরে বের হয়ে এলো। ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের নাম তো জানা হলো না! দেখো ওর মনটা একটু ভালো হয় কী না।"

আমরা আমাদের নাম বললাম, ভদ্রমহিলা একবার করে উচ্চারণ করে বললেন, "যাও বাবা তোমরা এই মেয়েটাকে একটু ঘুরিয়ে আন। দেখো ওর মনটা একটু ভালো হয় কী না।"

মেয়েটা আমাদের পিছু পিছু বের হয়ে এলো, বাইরে বের হয়ে আমার মনে হলো ভুলটা এখনই ভেঙ্গে দেয়া ভালো। আমরা যে মোটেও কোনো মেয়ের খোঁজে যাইনি, ছেলের খোঁজে গিয়েছি সেটা মেয়েটাকে এখনই জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, "ইয়ে মানে, টুনি, একটা জিনিস আগে একটু বলে নিই।"

টুনি আমার দিকে তাকাল, চোখের দৃষ্টিটা একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। আমি বললাম, "আসলে একটা ভুল হয়ে গেছে। আমরা আসলে তোমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের বয়সী কোনো ছেলে আছে কী না। ছেলে, বুঝেছ তো?"

টুনি মাথা নেড়ে জানাল যে সে বুঝেছে। আমি তবুও ঝুঁকি নিলাম না, আরো পরিষ্কার করে দিলাম, "আমরা কিন্তু, মানে, ইয়ে মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করি নাই। তাই তোমার কষ্ট করে আমাদের সাথে সাথে যাবার কোনো দরকার নাই। তুমি ইচ্ছে করলে এখন বাসায় চলে যেতে পার।"

"আর যদি না যাই?" এই প্রথম মেয়েটা কথা বলল, গলার স্বরটাও বরফের মতো ঠাণ্ডা।

আমি কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। আমতা আমতা করে বললাম, "মানে না যেতে চাইলে আসতে পার। কিন্তু তুমি যদি চাও তাহলে আমরা আমাদের পরিচিত মেয়েদের তোমার কথা বলতে পারি, তারা মনে করো বিকালের দিকে আসতে পারে–"

ঠিক তখন টেলিফোনের শব্দ হলো, আর মেয়েটা পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে ফোনটা ধরল। এই টুকুন পুচকে মেয়ে তার আবার মোবাইল টেলিফোন আছে! মেয়েটা বলল, "হ্যালো। টুশি। তোকে পরে ফোন করব। এখন খুবই একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। খুবই আজিব।"

অন্য পাশ থেকে যে ফোন করছে, টুশি না কে সে মনে হয় জানতে চাইল 'আজিব', ঘটনাটা কী? মেয়েটা তখন সেটা একটু ব্যাখ্যা করল, "আজিব মানে হচ্ছে কী, আমাদের বাসায় চারটা ছেলে এসেছে। তিনটা টিংটিংয়ে একটা একটু ভোঁটকা। এসে আম্মুকে জিজ্ঞেস করেছে–"মেয়েটা তখন টিটনের গলার স্বরটা নকল করে নাকী গলায় বলল, "খাঁলাম্মা আঁপনাদের বাঁসায় কী কোঁনো ছেঁলে টেঁলে আঁছে? আমি কিন্তু শুনেছি ছেলে-মেয়ে বলে নাই বলেছে ছেলে-টেলে। আম্মু তো বোকা-সোকা মানুষ ধরেই নিয়েছে ওরা বলেছে ছেলে-মেয়ে। তাই আমাকে জোর করে ওদের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি ওদের সাথে হাঁটছি। খুবই আজিব ব্যাপার। মনে হচ্ছে ওরা কোনোদিন কোনো মেয়ে দেখে নাই কথা বলা তো দূরের কথা! চারজনেই চূড়ান্ত নার্ভাস, একেবারে ঘেমে-টেমে যাচ্ছে। তোকে পরে সব বলব।"

মেয়েটা লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা পকেটে রেখে আমাদের দিকে তাকাল, বলল, "হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে?" ভাব-ভঙ্গি একেবারে বড় মানুষের মতো।

মেয়েটার কথা শুনে রাগের চোটে আমার কানের গোড়া পর্যন্ত গরম হয়ে গেছে। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "তুমি মেয়ে সেই জন্যে আমরা মোটেও

নার্ভাস না। আমরা অনেক মেয়ে দেখেছি।"

চঞ্চল বলল, "আমাদের ক্লাসের অর্ধেকর বেশী মেয়ে।"

অনু বলল, "আর আমরা যে মেয়েদের চিনি তারা খুবই ভালো। তারা খুবই সুইট। তারা কাউকে টিংটিংয়ে ডাকে না, কাউকে ভোঁটকাও ডাকে না।"

টিটন বলল, "তুমি মেয়ে বলে বেঁচে গেছ। ছেলে হলে এই রকম খারাপ খারাপ কথা বলার জন্যে পিটিয়ে তক্তা করে দিতাম। নতুন এসেছ বলে খাতির করতাম না।"

মেয়েটা খুবই মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনল তারপর মাথা নেড়ে বলল, "তাহলে দোষটা আমার? আমিও তাহলে বলতে পারি আমি অনেক ছেলেদের চিনি তারা কেউ আমাকে ডেকে এনে বলে না তুমি মেয়ে, তোমাকে আমাদের দরকার নেই। তুমি চলে যাও।"

আমি বললাম, "আমি ঠিক এইভাবে বলি নাই।"

"বলেছ।"

"আমি অনেক ভদ্রভাবে বলেছি।"

"খারাপ কথা ভদ্রভাবে বললে ভালো হয়ে যায় না। খারাপই থাকে।"

অনু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "তুমি আমাকে ভোঁটকা বলেছ।"

মেয়েটাকে এই প্রথমবার একটু কাচুমাচু দেখাল, বলল, "আমি সরি। তোমরা শুনে ফেলবে আমি বুঝি নাই। আর বলব না। আর মনে রাখ তোমরাও বলেছ আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানাবে। আমি সেটা শুনে ভয় পাই না, কিন্তু তোমরা সেটা আমাকে বলেছ।"

চঞ্চল এবারে বড় মানুষের মতো বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে। দুই পার্টিই ভুল করেছে। ভুলে ভুলে কাটাকাটি।"

টুনি নামের মেয়েটা রাজি হলো। বলল, "ঠিক আছে ভুলে ভুলে কাটাকাটি।"

চঞ্চল বলল, "তুমি চাইলে আমাদের সাথে আসতে পার। আমার আপু আছে, রাতুলের বোন মিথিলা আছে তাদের সাথে তোমাকে কথা বলিয়ে দেই। তুমি তাদের সাথে গল্প করতে পারবে, খেলতে পারবে।"

"আগে হলে হয়তো তাই করতাম। এখন দেরি হয়ে গেছে।"

চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "কীসের দেরি হয়ে গেছে?"

"এই যে তোরা আমাকে খসানোর চেষ্টা করছিস! আমি খসব না। আমি চিনে জোঁকের মতো তোদের সাথে লেগে থাকব।"

মেয়েটার কথা শুনে আমরা এতো অবাক হলাম যে, সে আমাদের তুই করে বলতে শুরু করেছে সেটা পর্যন্ত খেয়াল করলাম না। আমি আমতা আমতা করে বললাম, "চি-চিনে জোঁকের মতো?"

"হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি কখনো চিনে জোঁক দেখি নাই। শুধু বইয়ে পড়েছি যে মানুষ চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে। এখানে কী চিনে জোঁক আছে?"

চঞ্চল মাথা নাড়ল, "আছে।"

"ঢাকা শহরে কোনো চিনে জোঁক নাই। আসলে ঢাকা শহরে তেলাপোকা আর মশা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী নাই।"

আমি লক্ষ্য করলাম মেয়েটা অন্য কথা বলে আসল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছে। আমি তাকে আসল বিষয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম, "তুমি আমাদের সাথে চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা ছেলেরা যেগুলো করি সেইগুলো তোমার ভালো না লাগলেও তুমি আমাদের সাথে থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা যদি তোমাকে দলে নিতে না চাই তাহলেও তুমি আমাদের দলে ঢুকতে চাইবে?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা যদি তোমাকে এড়িয়ে চলি? তোমার কথার উত্তর না দিই? তোমাকে পাত্তা না দেই? খারাপ ব্যবহার করি? অপমান করি? তাহলে? তাহলে কী করবে?"

"অনেক কিছু করার আছে। সোজাটা বলব না কঠিনটা বলব?"

"সোজাটা শুনি।"

মেয়েটা তার পকেট থেকে টেলিফোন বের করে সেটাকে একটু টিপাটিপি করে একটা নম্বর বের করে আমাদের দেখাল। বলল, "এখানে কী লেখা আছে? পড়।"

আমরা পড়লাম, ইভটিজিং হট লাইন। মেয়েটা বলল, "আমি এই নম্বরে ফোন করে বলব চারটা ছেলে আমাকে ইভটিজিং করছে। তখন তারা

পুলিশকে ফোন করবে। পুলিশ ফোন করবে র‍্যাবকে। তারপর পুলিশ আর র‍্যাব মিলে এসে তোদের ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে যাবে।" মেয়েটা দাঁত বের করে হাসল, আর আমরা দেখলাম সে যখন হাসে তখন তাকে দেখতে বেশ ভালো মানুষের মতোই দেখায়। এরকম একটা ডেঞ্জারাস মেয়ে এরকম ভালো মানুষের মতো হাসতে পারে আমার সেটা নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস হতে চাইল না। আমি বললাম, তুমি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ, তাই না?"

"যতক্ষণ ঠাট্টা ততক্ষণ ঠাট্টা। যখন সিরিয়াস তখন সিরিয়াস।"

কথাটার ঠিক মানে কী আমরা কেউই ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাসার কাছে যে পেয়ারা গাছটা আছে তার কাছে চলে এসেছি। মেয়েটাকে খুব ভদ্রভাবে খসিয়ে দেওয়ার উপায় হচ্ছে পেয়ারা গাছটাতে উঠে বসে থাকা। মেয়েটা তখন তো আর নিচে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের সাথে কথা চালিয়ে যেতে পারবে না। খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে চলে যাবে। তাই আমরা আর কথা না বাড়িয়ে পেয়ারা গাছে উঠে গেলাম। আমি টিটন আর চঞ্চল সহজেই গাছে উঠতে পরি। অনুকে নিচে থেকে একটু ঠেলতে হয়। টুনি নামের মেয়েটাকে দেখানোর জন্যে আজকে অনু নিজেই হাচর-পাচর করে উঠে গেল।

মেয়েটা নিচে থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার চোখ দুটোতে কেমন যেন আনন্দের ছায়া পড়ল। খুশি খুশি গলায় বলল, "কী মজা! তোরা সত্যিকার গাছে উঠে বসে থাকিস! এটা কী গাছ? আম গাছ নাকী?"

মেয়েটা পেয়ারা গাছ পর্যন্ত চেনে না। আমি বললাম, "না, এটা পেয়ারা গাছ।"

"কী মজা! ঢাকা শহরে কোনো গাছ নাই। খুব বেশি হলে লাইটপোস্ট আছে! আমি উঠি?"

আমরা চমকে উঠলাম, বলে কী মেয়েটা? চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "তুমি আগে কখনো গাছে উঠেছ?"

"উঠি নাই তো কী হয়েছে? সব কিছুরই তো প্রথমবার আছে।"

আমি বললাম, "পড়ে ব্যথা পেলে কিন্তু আমাদের দোষ দিও না।"

"ভয় নাই। দিব না।" বলে মেয়েটা গাছটা ধরে বেশ তরতর করে বানরের মতো গাছে উঠে গেল। উপরে উঠে সে একেবারে বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে ওঠে, "একদম সোজা! আমি চিন্তাও করি নাই গাছে উঠা এতো

সোজা! আর গাছের উপর থেকে সবকিছু দেখতে কী মজা লাগে দেখেছিস?"

আমরা চারজন মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমাদের এতো সুন্দর পরিকল্পনাটা এভাবে মাঠে মারা যাবে একবারও চিন্তা করিনি। শুধু যে মাঠে মারা গেছে তা না বরং উল্টো দিকে কাজ করেছে। লাভের বদলে হয়েছে ক্ষতি।

টুনি গাছে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, "তোদের সাথে যখন প্রথম দেখা হলো তখন ভেবেছিলাম তোদের যখন মেয়েদের নিয়ে এতো এলার্জী তাহলে তোরা থাক তোদের মতো। আমি থাকব আমার মতো। পরে মনে হলো কেন এতো সহজে তোদের ছেড়ে দিব? জোর করে তোদের মাঝে ঢুকে যাব। এটা হবে আমার একটা প্রজেক্ট।"

"প্রজেক্ট?" চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "কিসের প্রজেক্ট?"

"মনে কর আমি ব্লগ লিখতে পারি আমি মেয়ে বলে কীভাবে চারজন ছেলে আমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু আমি চিনে জোঁকের মতো লেগে থেকে এক সময় তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছি!"

আমি আপত্তি করে বলতে চাইলাম যে আমরা "ঘৃণাভরে" প্রত্যাখ্যান করছি, কথাটা ঠিক না। টিটন বলতে চাইল যে টুনি নেতৃত্ব গ্রহণ করবে বিষয়টা এতো সোজা না, অনু বলতে চাইল যে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলতে হলে সেখানে চিনে জোঁকের উদাহরণ দেয়া ঠিক না কিন্তু চঞ্চলের মতো শান্ত -শিষ্ট মানুষ প্রায় চিৎকার করে বলল, "তুমি ব্লগ লিখ?"

"মাঝে মাঝে লিখি।"

চঞ্চল প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, "তোমার কম্পিউটার আছে?"

"পুরান-ধুরান ভাঙ্গাচুরা একটা ডেস্কটপ আছে। মাঝে মাঝে হার্ড ড্রাইভ থেমে যায় তখন জোরে লাথি দিতে হয়, তখন আবার চলে। ভাইরাসে ভাইরাসে বোঝাই।"

চঞ্চল চোখ বড় বড় করে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, আমরা বুঝতে পারলাম যে টুনির সবকিছু মাপ করে দিয়েছে! কয়দিন পর দেখা যাবে চঞ্চল আমাদের ফেলে দিয়ে টুনির বাসায় তার কম্পিউটারের সামনে পড়ে আছে। আমি টিটন আর অনু বোকার মতো তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারা কী নিয়ে কথা বলছে সেটাই বুঝতে পারছি না। বেইজ্জতি আর কাকে বলে!

চঞ্চলের কম্পিউটার না থাকতে পারে কিন্তু তার ঘর বোঝাই যে কতো

রকম যন্ত্রপাতি সেটা টুনিকে বলা দরকার, তা না হলে সে মনে করতে পারে আমরা সবাই বুঝি আলতু-ফালতু মানুষ। অন্যের কম্পিউটারের দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকি! আমি তাই বললাম, "আমাদের চঞ্চল কিন্তু অনেক বড় সাইন্টিস্ট!"

টুনি ভুরু কুঁচকে বলল, "সাইন্টিস্ট।"

চঞ্চল লজ্জা পেয়ে বলল, "ধুর! ফাজলেমি করবি না!"

"মোটেও ফাজলেমি করছি না। চঞ্চলের অনেকগুলো আবিষ্কার আছে। তুই যদি তার ল্যাবরেটরি ঘরটা দেখিস ট্যারা হয়ে যাবি।"

কথাটা শেষ করেই আমি বুঝতে পারলাম আমিও এখন টুনিকে তুই বলা শুরু করেছি!

অনু আর টিটন দুইজনই মাথা নাড়ল। অনু বলল, "একটা টেলিস্কোপ তৈরি করেছে সেটা দিয়ে চাঁদ দেখলে মনে হবে তুই চাঁদটা ছুঁতে পারবি! এতো কাছে।"

টিটন বলল, "প্রত্যেক মাসে চঞ্চল কিছু না কিছু আবিষ্কার করে।" সে উৎসাহের চোটে বলেই ফেলল, "আমাদের গুপ্তধন খোঁজার জন্যে একটা যন্ত্র বানাবে, সেটা দিয়ে বাইরে থেকে ভিতরের জিনিস দেখা যাবে! তাই নারে?"

আমি কনুই দিয়ে টিটনকে খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "এইটা গোপনীয় কথা। কাউকে বলার কথা না। গাধা কোথাকার।"

টিটনের মনে পড়ল, এবং জিবে কামড় দিল। টুনি কিছু না বুঝে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে? গুপ্তধন? কীসের গুপ্তধন?"

আমরা সবাই একসাথে মাথা নাড়লাম, "কিছু না। কিছু না।"

টুনি বুঝে গেল আমরা বলতে চাচ্ছি না তাই সে আমাদের চাপ দিল না, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল তাকে বলিনি দেখে তার একটু মন খারাপ হয়েছে। আমি কথাটা ঘোরানোর জন্যে বললাম, "আর আমাদের অনু হচ্ছে বিশাল সাহিত্যিক। লক্ষ লক্ষ বই পড়েছে।"

টিটন বলল, "ওদের বাসার বিড়ালটাও বই পড়তে পারে।"

চঞ্চল বলল, "যে কোনো জিনিসের বানান জিজ্ঞেস করলে বলে দিতে পারে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কিংবা মাগৃতিবিকৃতি–"

অনু বলল," মাগৃতিবিকৃতি কোনো শব্দ নাই।"

"ঐ হলো! বোঝানোর জন্যে বলেছিলাম।"

আমি বললাম, "অনুর সব কবিতা মুখস্থ। পৃথিবীর সব কবিতা।"

অনু লজ্জা পেয়ে বলল, "ধুর! মিথ্যা কথা বলবি না।"

"মিথ্যা কথা?" আমি বললাম, "ঐ যে ভীত কুক্কুর পালিয়ে যায় সেই কবিতাটা পুরাটা তোর মুখস্থ না?"

"এবার ফিরাও মোরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুরাটা মুখস্থ নাই।"

টুনি বলল, "শোনাও দেখি কতোটুকু মুখস্থ আছে।"

অনু বলল, "গাছের ডালে বানরের মতো ঝুলে ঝুলে কবিতা আবৃত্তি করা যায় নাকী!"

টুনি বলল, "আবৃত্তি করতে হবে না–মুখস্থ বলে যাও।"

অনু জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

টুনি বলল, "দেখব কতোটুকু মুখস্থ।"

অনু বলল, "খুব তাড়াতাড়ি বলি?"

"বল।"

অনু তখন ঝড়ের মতো এক নিঃশ্বাসে কবিতাটা মুখস্থ বলতে থাকে। বেচারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি এটা দেখতেন তাহলে মনে হয় একটু মন খারাপ করতেন। তার কবিতাটা একজন এভাবে সাপের মন্ত্রের মতো টানা বলে যাচ্ছে—মন খারাপ তো হতেই পারে। এই কবিতাটার মাঝে যখন অনু ধামকি দিয়ে "পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে" অংশটুকু বলেছে তখন টুনির টেলিফোনটা আবার বাজল, ফোনটা ধরেই টুনি চিৎকার করে বলল, "টুনি তুই চিন্তাও করতে পারবি না আমি এখন কোথায়!"

টুনি নিশ্চয়ই অনুমান করে বলার চেষ্টা করেছে সে কোথায়, কিন্তু কোনোটাই হলো না, তখন টুনি চিৎকার করে বলল, "আমি একটা গাছের উপর! সত্যিকারের গাছ! চারদিকে ছোট ছোট বিন্দি বিন্দি পেয়ারা। ইচ্ছা করলেই ছিড়তে পারি!"

এই জিনিসটা কেন এতো উত্তেজনার আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হলো টুনি এবং টুশি দুজনেই এটা নিয়ে খুব উত্তেজিত। একটু পরেই টুশি নিশ্চয়ই টুনির কাছে জানতে চাইল "আজিব" ছেলেগুলোর কী খবর, কারণ শুনলাম টুনি বলছে, "ও হ্যাঁ। আজিব ছেলেগুলো আছে আমার কাছেই, আমি ওদের সাথেই গাছে বসে আছি! হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা আসলেই

আজিব। তবে খারাপভাবে আজিব না ভালোভাবে আজিব। একজন হচ্ছে সায়েন্টিস্ট খালি আবিষ্কার করে। আরেকজনের পুরা সঞ্চয়িতা মুখস্থ। একেবারে গুলির মতো মুখস্থ বলে যায়। টুশি তুই বিশ্বাস করবি না জায়গাটা কতো সুন্দর, চারদিকে গাছপালা, সেইখানে আবার সত্যিকারের পাখি। আমাদের বাসার সামনে বিশাল মাঠ, এক মাথা থেকে অন্য মাথা দেখা যায় না এতো বড়! এখানে কোনো গাড়ি নাই, ট্রাফিক জ্যাম নাই। বাতাস পরিষ্কার। নিঃশ্বাস নিলে মনে হয় পরিষ্কার বাতাস দিয়ে ফুসফুসটা ধুয়ে ফেলছি। তুই একাবর আয়, দেখলে ট্যারা হয়ে যাবি!"

টুনি অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলে শেষ পর্যন্ত ফোনটা রাখল, রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটার ঢাকার জন্যে মন খারাপ হচ্ছে। টেলিফোনে বন্ধুর কাছে বানিয়ে বানিয়ে এই জায়গাটা নিয়ে ভালো ভালো কথা বলছে, কিন্তু আসলে যারা বড় শহরে থাকে তারা কখনো ছোট জায়গায় এসে ভালো থাকে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "টুশি তোর বন্ধু?"

"ওর নাম টুশি না। ওর নাম তাসনুভা। আমি আমার নামের সাথে মিলিয়ে টুশি ডাকি।"

"ও।"

আমরা আরো কিছুক্ষণ গাছে বসে রইলাম। একটু পার আরো বাচ্চা-কাচ্চারা বের হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল তখন আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম। টুনিকে একজন নতুন মানুষ দেখে সবাই আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মিথিলাও ছুটতে ছুটতে এলো, বলল, "আপু, তুমি ভাইয়াদের সাথে গাছে উঠে বসেছিল? সর্বনাশ! তুমি জান ভাইয়ারা কী করে? আর কখনো ওদের সাথে মিশবে না! তোমার মাথার উপরে বিষ পিঁপড়া দিয়ে দিবে। আমার নাম মিথিলা। ক্লাস সিক্সে পড়ি। পি. কে. গালর্স স্কুল। তুমি কোন ক্লাসে পড়? আগেই বল না, আমি আন্দাজ করি। ক্লাস সেভেন। হয়েছে? কোন স্কুলে পড়বে তুমি? প্লীজ প্লীজ তুমি আমাদের স্কুলে ভর্তি হবে। প্লীজ প্লীজ। তোমার নাম কী আপু? দাঁড়াও দাঁড়াও আগেই বল না, আমি আন্দাজ করি। তোমার নাম নিতু। হয় নাই? তাহলে প্রিয়াংকা? হয় নাই? মিলি? হয় নাই? লীনা? হয় নাই?"

আমার টুনির জন্যে মায়া লাগতে থাকে!

৪.

সকালে আমি গপ গপ করে নাস্তা করছি তখন আম্মু বললেন, "কী হলো? তোর এতো তাড়াহুড়া কিসের? ট্রেন ধরবি নাকী? আস্তে আস্তে খা।"

আমি বললাম, "আস্তে আস্তেই তো খাচ্ছি।" বলে আবার গপ গপ করে খেতে থাকি।

মিথিলা বলল, "আমি জানি ভাইয়া কেন এতো তাড়াতাড়ি খাচ্ছে।"

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "তুই কী জানিস?"

মিথিলা তখন সুর করে বলল, "ব্ল্যা-ক-ড্রা-গ-ন!"

আমি রেগে বললাম, "তুই আমার কাগজগুলো দেখেছিস? কেন তুই আমার কাগজ দেখবি? আমার পারমিশন না নিয়ে তুই কেন আমার কাগজ দেখলি?"

মিথিলা খুব বোকা বোকা চেহারা করে বলল, "আমি তো বুঝি নাই এটা দেখা যাবে না। তুমি তো কাগজের উপর লিখে রাখ নাই এটা দেখা যাবে না।"

"তুই যদি কাউকে এটার কথা বলিস তাহলে আমি তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলব।"

"আমাকে তোমাদের ব্ল্যাক ড্রাগন দলে নাও তাহলে কাউকে বলব না!"

"কী?" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "তুই ব্ল্যাক ড্রাগন হবি? ইশ! সখ দেখে বাঁচি না।"

"তাহলে আমি সবাইকে বলে দেব!"

"বলে দেখ, আমি তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলব।"

মিথিলা তখন নাকী সুরে কান্নার ভঙ্গি করে বলল, "আঁম্মু দেঁখ ভাঁইয়া আঁমাকে মাঁরবে!"

আম্মু দুইজনকেই ধমক দিলেন। বললেন, "ব্যস অনেক হয়েছে। দুইজনই থাম–তোদের যন্ত্রণায় আমাদের পাগল হয়ে যাবার অবস্থা।"

আমি নাস্তা করে টেবিল থেকে কাগজগুলো নিয়ে বের হলাম। কালকে রাত জেগে আমি ব্ল্যাক ড্রাগন দলের কাজকর্ম কীভাবে চালানো হবে, সদস্য হতে হলে কীভাবে ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে সেগুলো তৈরি করেছি। পুরো কাজটা করেছি গোপনে, কেউ যেন দেখতে না পারে আর পাজী মিথিলাটা সবকিছু পড়ে ফেলেছে। কোনো একদিন আমি মনে হয় মিথিলাকে খুনই করে ফেলব।

চঞ্চলের বাসা আমাদের বাসার খুব কাছে। দোতলায় চিলেকোঠার ঘরটা চঞ্চলের ল্যাবরেটরি, আমি নিচতলায় তাকে খোঁজ না করে সোজা দোতলায় উঠে গেলাম, কারণ আমি জানি চঞ্চল এখন এখানেই থাকবে।

চঞ্চলের দরজাটা খোলা, আমি দেখলাম সে আমার দিকে পিছন ফিরে কাজ করছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে মুখ না ঘুরিয়েই বলল, "রাতুল তুই আজকে লাল রঙের সার্ট পরে এসেছিস!"

আমি বললাম, "আমার দিকে না তাকিয়ে কেমন করে বলছিস?"

"এই দেখ।"

আমি কাছে গিয়ে দেখলাম একটা রঙিন টেলিভিশন সেখানে রাতুলের বাসার সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছি তখন নিশ্চয়ই আমাকে এখানে দেখেছে। জিজ্ঞেস করলাম, "টেলিভিশন কোথায় পেলি?"

"বাসার।"

"তোদের বাসার টেলিভিশন তোকে দিয়ে দিয়েছে?"

"দেয় নাই। ঠিক করতে দিয়েছে।"

"তোকে টেলিভিশন ঠিক করতে দিয়েছে?"

চঞ্চল মুখ বাঁকা করে হেসে কী একটা জিনিস টেলিভিশনের উপরে রাখল। সাথে সাথে টেলিভিশনের ছবিটা পেঁচিয়ে কেমন যেন বিদঘুটে হয়ে গেল। চঞ্চল আমাকে সেটা দেখিয়ে বলল, "টেলিভিশনের কাছে পাওয়ারফুল চুম্বক ধরলে ছবিটা এরকম হয়ে যায়। আমি তাই করেছি–সবাই ভেবেছে টেলিভিশন নষ্ট হয়ে গেছে! টিভি মেকানিকের কাছে পাঠাবে—" চঞ্চল চোখ নাচিয়ে বলল, "আমি বলেছি আমি ঠিক করে দেব। সেই জন্যে

আমাকে দিয়েছে!"

চঞ্চল টেলিভিশনের উপর থেকে চুম্বকটা সরাতেই আবার ছবিটা ঠিক হয়ে গেল। চঞ্চল সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি বলেছি মেকানিককে যত টাকা দিতে হতো আমাকে তার অর্ধেক দিলেই হবে। জানি না দিবে কী না!"

চঞ্চলের ফিচলে বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হলাম। বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞানের বুদ্ধির সাথে সাথে নিশ্চয়ই ফিচলে বুদ্ধিও থাকে!

চঞ্চল বলল, "বাইরে থেকে ভিতরের জিনিস দেখার জন্যে যন্ত্রটা তৈরি করেছি–কিন্তু মুশকিল হলো এটা আমরা মিশকাত মঞ্জিলে কেমন করে নিব? এতো বড় টেলিভিশন যদি নিয়েও যাই সেখানে তো ইলেকট্রিসিটি নাই। কেমন করে দেখব?"

"তাহলে উপায়?"

"একটা জেনারেটর হলে হতো। কিংবা ব্যাটারি দিয়ে চলে সেরকম একটা টেলিভিশন।"

"জেনারেটরের কত দাম!"

"অনেক। আর সেটা চালালে যেরকম ভটভট শব্দ করবে তখন সবাই জেনে যাবে কিছু একটা হচ্ছে।"

"তাহলে?'

চঞ্চল মাথা চুলকে বলল, "আরেকটা হতে পারে একটা রিমোট ক্যামেরা। একটা গাড়ির উপর বসিয়ে সেটা ভিতরে পাঠালাম, সেটাকে বাইরে থেকে কন্ট্রোল করে ছবি তুললাম, তারপর বাইরে নিয়ে এসে ছবিগুলো দেখলাম।"

আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, "গুড আইডিয়া!"

"সেটাই এখন তৈরি করছি। সমস্যা হচ্ছে–"

"কী সমস্যা?"

"ক্যামেরাটা আব্বুর–যদি কিছু একটা হয় তাহলে আব্বু আমাকে খুন করে ফেলবে!"

"ক্যামেরার কী হবে?"

"মনে কর ভিতরে একটা গর্ত, আমার রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি গর্তের ভিতর পড়ে গেল তাহলে তো আর গর্তের ভিতর থেকে বের হতে পারবে

না।"

"তাহলে?"

চঞ্চল মুখ কালো করে বলল, "এরকম হাইফাই যন্ত্র ব্যবহার না করে খুব সোজাভাবে দেখা যায়, একটা আয়না আর একটা টর্চ লাইট দিয়ে! কিংবা একটা ছোট পেরিস্কোপ তৈরি করলাম, সেটা দিয়ে ভিতরে দেখলাম। কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

"সেটা তো সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক উপায় হলো না ! আমি চাচ্ছিলাম খুবই ফাটাফাটি ইলেকট্রনিক্স রিমোট কন্ট্রোল ওয়ারলেস এইরকম কিছু একটা তৈরি করতে!"

এই হচ্ছে আমাদের চঞ্চল—যে কাজটা সোজাভাবে করা যায় সেই কাজটাও কঠিনভাবে করবে! কে জানে বৈজ্ঞানিকেরা মনে হয় এ রকমই হয়। আমি চঞ্চলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে বললাম, "এইবারে সোজাভাবে করে ফেল। আয়না আর চর্ট লাইট দিয়ে। পরেরবার ফাটাফাটি ইলেকট্রনিক্স দিয়ে করিস।"

চঞ্চল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে!"

এরকম সময়ে আমরা টেলিভিশনে দেখলাম টিটন আর অনু সিঁড়ি দিয়ে আসছে। তাদের হাতে একটা চীপসের প্যাকেট, আমরা দেখলাম তারা দুজন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পুরো প্যাকেটটা খেয়ে শেষ করল তারপর চীপসের প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে মুখ মুছে উপরে উঠতে শুরু করল। কতো বড় নিমকহারাম, আমাদের যেন দিতে না হয় সে জন্যে পুরোটা খেয়ে শেষ করে উপরে উঠছে!

একটু পরেই আমরা তাদের দুজনকে দরজায় দেখলাম। টিটন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "রাতুল! তোদের বাসায় গিয়েছিলাম। খালাম্মা বললেন তুই এইখানে।"

"হ্যাঁ। আমি এইখানে। ব্ল্যাক ড্রাগনের কাজ করার জন্যে সকালবেলা চলে এসেছি।"

দুইজনে ভিতরে ঢুকে টেলিভিশনটা দেখে অবাক হয়ে বলল, "টেলিভিশন? নাটক দেখাচ্ছে নাকী?"

আমি বললাম, "না। এটা চঞ্চলের যন্ত্র। এটা দিয়ে ঘরে বসে

সিঁড়িতে কী হচ্ছে দেখা যায়। আমরা এক্ষুণি দেখলাম তোরা দাঁড়িয়ে রাক্ষসের মতো দুজনে পুরা চীপসের প্যাকেটটা খেয়ে শেষ করেছিস। আমাদেরকে যেন দিতে না হয় সেইজন্যে।"

একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে দুজনের মুখেই একটু লজ্জার ভাব ফুটল। টিটন অবিশ্যি সাথে সাথেই লজ্জা কাটিয়ে বলল, "অল্প কয়টা চীপস–এতোজন মানুষ, সবার ভাগে কম পড়বে। সেই জন্যেই তো!"

আমি বললাম, "মোটেও অল্প কয়টা চীপস ছিল না। বিরাট বড় প্যাকেট ছিল।"

চঞ্চল বলল, "আর খালি প্যাকেটটা ফেলেছিস সিঁড়িতে। পরিবেশ দূষণ।"

অনু বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরেরবার তোদের নিয়ে খাব।"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "আমাদের ব্ল্যাক ড্রাগনের কী কী উদ্দেশ্য সব আমি কাগজে লিখে এনেছি। এই দেখ, প্রথমেই লেখা আছে একজন ব্ল্যাক ড্রাগন অন্য ব্ল্যাক ড্রাগনকে সহযোগিতা করবে। একজন বিপদে পড়লে আরেজকন বুকের রক্ত দিয়ে হলেও তাকে রক্ষা করবে। আর তোরা দুজনে চীপসের প্যাকেটটা খেয়ে ফেললি?"

অনু বলল, "ঠিক আছে, বললাম তো আর খাব না। এখন আমাকে দেখা কী কী লিখেছিস।"

আমি কাগজগুলো বের করলাম। প্রথম কাগজটা হচ্ছে ব্ল্যাক ড্রাগন হবার আবেদনপত্র। ডান দিকে ছবি লাগানোর জায়গা, উপরে একটা কালো ড্রাগনের ছবি। নাম ঠিকানা, নিচে একটা অঙ্গীকারনামা। একজন ব্ল্যাক ড্রাগন কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না তার একটা লম্বা তালিকা। তাছাড়াও যারা ব্ল্যাক ড্রাগন হবে তাদের জন্য একটা ছোট কার্ড। সেটা আবার লেমিনেট করা হবে। সব ব্ল্যাক ড্রাগনকে সব সময় সাথে এই কার্ড রাখতে হবে।

চঞ্চল বলল, "সবই ঠিক আছে। কিন্তু পুরো জিনিসটা আসলে কম্পিউটারে টাইপ করে প্রিন্টারে প্রিন্ট করলে ভালো হতো।"

আমি একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম, "কেন আমার হাতের লেখা কী খারাপ!"

টিটন বলল, "যথেষ্ট খারাপ। হাত দিয়ে লিখিস না পা দিয়ে লিখিস বোঝা যায় না।"

"বাজে কথা বলবি না।" আমি রেগে বললাম, "তোর নিজের হাতের লেখাটা কোনোদিন দেখেছিস? বাংলা লিখেছিস না চাইনিজ লিখেছিস সেটাই বোঝা যায় না!"

টিটন রেগে উঠে আরেকটা কী বলতে চেয়েছিল কিন্তু হঠাৎ করে আমরা সবাই থেমে গেলাম। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে টুনি আর মিথিলা উঠে আসছে। দুজন সিঁড়ির মাঝখানে থেমে গেল, নিজেরা হাত নেড়ে কী যেন কথা বলল। কথা শেষ করে দুজনেই মুখে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ হাসল। তারপর টুনি হাত দিয়ে তার চুলগুলো ঠিক করল, মনে হলো মিথিলাকে জিজ্ঞেস করল তাকে কেমন দেখাচ্ছে। মিথিলা নিশ্চয়ই বলল ভালোই দেখাচ্ছে তখন দুজনেই আবার উপরে উঠতে শুরু করল।

একটু পরেই আমরা তাদের দুজনকে দরজার সামনে দেখতে পেলাম। আমরা অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। টুনি বলল, "আমি আর মিথিলা এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মিথিলা বলল, তোরা এখানে আছিস! তাই ভাবলাম তোদের একটু দেখে যাই!"

ডাহা মিথ্যা কথা! নিশ্চয়ই অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে, সেই আসল কথাটা শোনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। টুনি ভান করল হঠাৎ যেন তার কিছু একটা মনে পড়েছে, তখন সে হাতের একটা প্যাকেট থেকে কিছু কাগজ বের করে বলল, "ও আচ্ছা! আমি আর মিথিলা কথা বলছিলাম। আমরা ঠিক করেছি আমরা একটা ক্লাব করব।"

আমরা একসাথে বললাম, "ক্লাব?"

"হ্যাঁ। নাম দিয়েছি ব্ল্যাক ড্রাগন। যারা মেম্বার হবে তাদেরকে বলা হবে ব্ল্যাক ড্রাগন! ব্ল্যাক ড্রাগন হবার আবেদনপত্র তৈরি করেছি, এই দেখ!"

আমরা দেখলাম কম্পিউটারে টাইপ করা আবেদনপত্র। উপরে একটা কালো রঙের ড্রাগনের ছবি। ডান পাশে টুনির রঙিন ছবি। অন্যটাতে মিথিলার। ঠিক আমরা যেরকম আলোচনা করেছিলাম। আবেদনপত্রের নিচে অঙ্গীকারনামা, ব্ল্যাক ড্রাগনেরা কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না তার একটা লম্বা তালিকা। দেখে আমরা এতো অবাক হলাম যে কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

টুনি প্যাকেট থেকে দুইটা ছোট ছোট কার্ড বের করে বলল, "আর প্রত্যেক ব্ল্যাক ড্রাগনের থাকবে এই কার্ড। লেমিনেট করা। সব সময় সাথে রাখতে হবে। একজন ব্ল্যাক ড্রাগন এটা দেখালেই অন্য সব ব্ল্যাক ড্রাগন তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। দরকার হলে বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করবে। তাই না রে মিথিলা?"

মিথিলা কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল।

তখন টিটন একটা গর্জনের মতো শব্দ করল। আমি বললাম, "ব্ল্যাক ড্রাগন হচ্ছে আমাদের ক্লাবের নাম। আমাদের।"

টুনি শুনে খুবই খুশি হওয়ার ভান করল, বলল, "তাহলে তো আরো ভালো। হয় তোরা আমাদের ক্লাবে যোগ দিবি। না হয় আমরা তোদের ক্লাবে যোগ দিব। ছয়জন ব্ল্যাক ড্রাগন! ফ্যান্টাস্টিক!"

টিটন আবার গর্জনের মতো শব্দ করল।

টুনি বলল, "কী হলো? হ্যাঁ, না কিছু বলছিস না কেন? শুধু নাক দিয়ে শব্দ করছিস কেন?"

আমি আবার চিৎকার করে বললাম, "ব্ল্যাক ড্রাগন আমাদের।"

টুনি বলল, "আমিও তো তাই বলছি! ব্ল্যাক ড্রাগন আমাদের। তোরা চারজন আর আমরা দুইজন–সব মিলিয়ে আমাদের ছয়জনের।"

আমরা কী বলব বুঝতে পারছিলাম না, তখন টুনি বলল, "ঠিক আছে। ঠিক আছে কোনো তাড়াহুড়া নেই। তোরা চিন্তা-ভাবনা করে আমাদেরকে বলিস!"

তারপরে আমাদের কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আমরা তখন আমাদের টেলিভিশনের দিকে তাকালাম, দেখলাম টুনি আর মিথিলা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ছে! কী বলছে শুনতে পাচ্ছি না–শুধু দেখতে পাচ্ছি। সেটা দেখেই আমাদের তালু গরম হয়ে গেল। এইটুকুন মেয়ের কী ফিচলে বুদ্ধি, বাবারে বাবা!

আমাদের কিছুক্ষণ লাগল শান্ত হতে, সবার আগে শান্ত হলো টিটন, সে মেঝেতে থাবা দিয়ে বলল, "খুন করে ফেলব আমি। আমাদের ক্লাব হাইজ্যাক করে নিয়ে যাবে? এতো বড় সাহস?"

চঞ্চল কম্পিউটার দিয়ে কম্পোজ করে ছাপানো ফর্মটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, "দেখেছিস! কী সুন্দর ফর্মটা তৈরি করেছে?"

অনু বলল, "রাতুলেরটাতে কতো বানান ভুল এইটাতে একটা বানান ভুল নাই।"

আমি গরম হয়ে বললাম, "শুধু বানান ভুল না থাকলে আর সুন্দর হলেই হলো? আমাদের ক্লাবটা চোট্টামি করে দখল করে নিবে?"

চঞ্চল বলল, "দখল তো করে নাই। তারা তো বলেছে আমরা সবাই মিলে করব–"

টিটন বলল, "কখনো না। ব্ল্যাক মার্ডারে আমরা ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না।

আমি বললাম, "আমি আগে থেকে বলে রাখলাম, যদি ব্ল্যাক ড্রাগনে মিথিলা এসে ঢুকে তাহলে আমি সেখানে নাই। বাসায় আমার জীবন নষ্ট করে ফেলেছে এখন বাইরেও আমার জীবনটাকে নষ্ট করবে? তোরা জানিস মিথিলা কী করে? আমার আম্মুর কাছে দিনরাত কী রকম নালিশ করে তোরা সেটা কোনোদিন শুনেছিস?"

অনু বলল, "ছোট বোনেরা সব সময়েই একটু আহ্লাদী হয়।"

"আহ্লাদী মোটেই না। ডেঞ্জারাস। দেখছিস না ব্ল্যাক ড্রাগনের সবকিছু টুনিকে বলে দিয়েছে? মিথিলা না বললে টুনি কী জানতে পারত?"

"মিথিলা জানল কেমন করে?"

"আমি যখন লিখেছিলাম তখন চুরি করে পড়েছে।"

চঞ্চল ফর্মটার দিকে তাকিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কী সুন্দর ফর্মটা তৈরি করেছে দেখেছিস? কম্পিউটার হচ্ছে একটা ম্যাজিক! ইশ! আমার যদি একটা কম্পিউটার থাকত!"

চঞ্চল তার পেরিস্কোপ তৈরি শেষ করল বিকেলের দিকে। ঘেরিস্কোপের সাথে একটা টর্চ লাইট নিয়ে তখন আমরা মিশকাত মঞ্জিলের দিকে রওনা দিলাম। বাচ্চারা বাইরে ছোটাছুটি করছে, তাদের মাঝে মিথিলাও আছে। আমরা টুনিকেও দেখলাম, সে পেয়ারা গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করল, "তোরা কোথায় যাচ্ছিস?"

আমরা প্রথমে না শোনার ভান করলাম, যখন আবার জিজ্ঞেস করল তখন বললাম, "এই তো ওই দিকে!"

আমরা ভয় পাচ্ছিলাম টুনি হয়তো এখন আমাদের সাথে রওনা দেবে,

কিন্তু আমাদের খুব কপাল ভালো যে ঠিক তখন তার একটা ফোন এসে গেল। মনে হলো জরুরি ফোন কারণ দেখলাম সে হাত পা নেড়ে কথা বলতে শুরু করেছে আমরা তখন পা চালিয়ে সরে গেলাম। এখন চেষ্টা করলেও আমাদের পিছু নিতে পারবে না।

মিশকাত মঞ্জিলের কাছাকাছি এসে টিটন আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করল, বলল, "আমাদের কী ভেতরে যেতেই হবে? অন্য কোথাও যেতে পারি না?"

"অন্য কোথায়?"

"এই ধর নদীর ধারে কোথাও, না হলে পুকুর ধারে।"

চঞ্চল বলল, "কিন্তু গোপন কুঠুরি তো খালি এখানেই আছে!"

"গোপন কুঠুরি ছাড়া কী এডভেঞ্চার হয় না?"

"এটা শেষ করে নেই, তারপর দেখা যাবে।"

কাজেই টিটন খুব বিরস মুখে আমাদের পিছু পিছু এলো। আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন সময়টা ছিল দুপুর, আলো ছিল অনেক বেশি। আজকে বিকেল হয়ে গেছে তাই গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। চারদিকে এক ধরনের ছমছমে ভাব। শুধু টিটন না, আমাদেরও কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে। আমরা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সেই ঘরটাতে যাই। আগের দিন একটা বেজি বের হয়ে এসেছিল, আজকেও কিছু বের হবে কীনা বুঝতে পারছিলাম না। আমি দেয়ালটাতে দুটো লাথি দিলাম, যদি কিছু বের হতে চায় তাহলে যেন আগেই বের হয়ে যায়। কিছু বের হলো না। তখন চঞ্চল উবু হয়ে ছোট গর্তটা দিয়ে টর্চ লাইটটা ঢুকিয়ে দেয়, ভেতরটা নিশ্চয়ই এখন আলোকিত হয়ে উঠেছে, আমাদের মনে হলো ভেতরে ডানা ঝটপট করে কিছু উড়তেও শুরু করেছে।

চঞ্চল তখন সাবধানে তার পেরিস্কোপটা ঢুকিয়ে দেয়, তারপর চোখ লাগিয়ে দেখে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী দেখা যায়।"

"একটা ঘর।"

"কী আছে ঘরের ভেতর?"

"কিছু নাই। বাদুর উড়ছে।"

"বাদুর ছাড়া আর কিছু নাই?"

"দাঁড়া দেখি।" চঞ্চল খানিকক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর বলল, "মনে হচ্ছে এখান থেকে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।"

"সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে? সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

আমি চঞ্চলকে সরিয়ে বললাম, "দেখি, আমাকে দেখতে দে।"

পেরিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ভেতরে দেখা যায় সত্যি কিন্তু কোনটা সোজা কোনটা উল্টো বুঝতে সময় লাগে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে আমার মনে হলো চঞ্চল ঠিকই বলেছে। সত্যিই একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। তার মানে এই গোপন কুঠুরিটাতেই রহস্য শেষ না! এখান থেকে রহস্য শুরু। কী সাংঘাতিক ব্যাপার।

টিটন সারাক্ষণ উশখুশ করছিল, "এবারে বলল, অনেক হয়েছে। চল যাই।"

আমরাও তখন উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "চল।"

যখন মিসকাত মঞ্জিল থেকে বের হয়েছি তখন বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। এখন কী করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছিলাম, বাসার কাছে এসে দেখি টুনি তখনো পেয়ারা গাছে বসে আছে। আমাদের দেখে বলল, "কোথায় গিয়েছিলি?"

আমি বললাম, "এই তো!"

"এই তো মানে কোথায়?"

"এই তো মানে এইখানে।"

টুনি তখন গাছ থেকে নেমে আসে। আমাদের কাছে এসে বলল, "আমি কী বলেছিলাম মনে আছে?"

"কী?"

"আমি তোদের সাথে চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকব?"

"মনে আছে।"

"আমি কিন্তু লেগে আছি। তোরা টের পাচ্ছিস?"

টিটন বলল, "না।"

টুনি হাসির মতো ভঙ্গি করে বলল, "পাবি! টের পাবি।"

তারপর সে হেঁটে হেঁটে তার বাসার দিকে চলে গেল। তাকে দেখে মনে হলো তার বুঝি কোনো কিছু নিয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।

৫.

চঞ্চল তার দুই হাত তুলে বলল, "আমার হাতে কিছু দেখছিস?"

আমি ভালো করে লক্ষ্য করে বললাম, "হাতে আংটি পরেছিস? দুই হাতে দুইটা?"

চঞ্চল বলল, "দেখে তোর তাই মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে। কাছে আয়।"

আমি কাছে গেলাম, তখন সে তার দুই হাত দিয়ে আমাকে ধরল আর সাথে সাথে কী হলো কে জানে ভয়ঙ্কর একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে আমি ছিটকে পড়লাম। আমার মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে আর আমি ভয়ে আতঙ্কে যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

চঞ্চল আমার অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকে, আর সেটা দেখে আমার রেগে আগুন হয়ে যাবার কথা কিন্তু ইলেকট্রিক শক খেয়ে এতো অবাক হয়েছি যে আমি রাগতেও পারছিলাম না। আমি উঠে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলাম, "কীভাবে করলি?"

"ইনডাকশন কয়েল?"

"সেটা আবার কী?"

"একটা লোহার উপর কয়েল পেঁচিয়ে তৈরি করতে হয়। একটা ব্যাটারি হচ্ছে মাত্র দেড় ভোল্টের, সেটাকে বাড়িয়ে কয়েক হাজার ভোল্ট করে ফেলা যায়।"

আমি শুকনো মুখে বললাম, "সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কিছু নাই! ভোল্টেজ বেশি কিন্তু কারেন্ট খুবই কম। কোনো ক্ষতি হবে না।"

"কী আজব। আমি ইলেকট্রিক শক খাচ্ছি কিন্তু তুই খাচ্ছিস না

কেন?"

চঞ্চল হা হা করে হাসল, বলল, "এই দেখ। আমার দুই হাতে দুইটা আংটি আসলে দুইটা ইলেকট্রড। এই দ্যাখ পিছন দিকে তার লাগানো আছে, সেটা গেছে আমার পকেটে। পকেটে ইনডাকশন কয়েলটা রেখেছি। আংটি দুটির ভিতরের দিকে প্লাস্টিক লাগানো, তাই সেটা আমার শরীরকে ছুঁচ্ছে না, তাই আমাকে শক দিচ্ছে না! যখন তোকে ধরছি তোকে শক দিচ্ছে!"

"কী আশ্চর্য!"

"এটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক ড্রাগনের একটা অস্ত্র। আমরা এরকম অস্ত্র তৈরি করে সবাই একটা করে নিয়ে ঘুরব। কেউ আমাদেরকে কিছু করতে এলেই আমরা জ্যাপ করে ইলেকট্রিক শক দিয়ে দিব!"

"একটা তৈরি করতে কত খরচ হবে?"

"খুব বেশি না। টেলিভিশন সারিয়ে দিয়েছি তাই আব্বু কিছু টাকা দিয়েছে। দরকার হলে ফ্রিজটা নষ্ট করে রাখব। তখন আরো কিছু টাকা হবে।"

আমি মাথা নাড়ালাম, চঞ্চল ঠিকই বলেছে। এটা হবে একটা অসাধারণ অস্ত্র! ইনডাকশন কয়েলটা কেমন করে তৈরি করে যখন সেটা নিয়ে চঞ্চলের সাথে কথা বলছি তখন টিটন এসে হাজির হলো। কী কারণ কে জানে আজকে তার মুখে বিচিত্র একটা হাসি। আমি টিটনকে বললাম, "চঞ্চল কী তৈরি করেছে, দেখ!"

টিটন জিনিসটা দেখার জন্যে এগিয়ে গেল, চঞ্চল তার দুই হাত বাড়িয়ে দেয় আর আমি দেখতে পেলাম পরের মুহূর্তে বিশাল একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে টিটন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ছিটকে পড়েছে।

এবারে আমি আর চঞ্চল হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকি। টিটন প্রথমে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর রেগে উঠে চিৎকার করে বলল, "আমাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিস? সেটা দেখে আবার দাঁত কেলিয়ে হাসছিস? ঘুষি মেরে তোদের নাক ভেঙ্গে দেব।"

সেটা অবিশ্যি খুব অস্বাভাবিক কিছু না, টিটন রেগে গেলে ঘুষি মেরে নাক ভেঙ্গেও দিতে পারে, তাই আমরা হাসি থামিয়ে ফেললাম। বিজ্ঞানের এতো বড় আবিষ্কার নিয়ে টিটন কোনো কৌতূহল দেখাল না, রাগে গজগজ

করতে লাগল। চঞ্চল আর আমি তখন তাকে বিষয়টা বোঝালাম আর তখন আস্তে আস্তে তার রাগটা একটু কমে এলো। শেষে তার মুখে আবার আগের সেই বিচিত্র হাসিটা ফুটে ওঠে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুই এরকম করে হাসছিস কেন?"

"কে বলছে আমি হাসছি?" তার মুখের হাসিটা আরো বড় হয়ে যায়, বলে, "আমি মোটেও হাসছি না!"

"এই যে হাসছিস?"

টিটন হাসি হাসি মুখ করে তার সার্টের হাতাটা একটু তুলে বলল, "এই দেখ।"

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, সেখানে বিশাল একটা তাবিজ কালো সুতা দিয়ে বাঁধা। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কিসের তাবিজ?"

টিটন বলল, "ভূতের।"

"ভূতের তাবিজ?"

"শুধু ভূত না—জিন, পরী, প্রেতাত্মা কেউ এখন আর আমার ধারেকাছে আসতে পারবে না। এখন আর আমার মিশকাত মঞ্জিলে যেতে কোনো ভয় করবে না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি চাইলে একা একা যেতে পারব।"

চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে জানিস এই তাবিজটা কাজ করে?"

টিটন বলল, "আমি জানি।"

"কেমন করে জানিস?"

টিটন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাবিজটা খুলে চঞ্চলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুই এটা হাতের মুঠোয় ধরে রাখ, দেখবি আস্তে আস্তে তাবিজটা গরম হয়ে উঠছে।"

চঞ্চল হাতের মুঠোয় ধরে রাখল, টিটন একটু পরে জিজ্ঞেস করল, "গরম হয়েছে? হয়েছে গরম?"

"বুঝতে পারছি না।"

"অবশ্যই বুঝতে পারবি। ধরে রাখ।"

চঞ্চল হাতের মুঠো খুলে বলল, "আসলে একটা থার্মোমিটার ধরে দেখতে হবে গরম হচ্ছে নাকী।"

চঞ্চল বলল, "দেখ।"

চঞ্চল বলল, "তুই তাবিজটা রেখে যা। আমি সত্যি সত্যি পরীক্ষা করে দেখব। আমার হাতের তালুর তাপমাত্রা মাপতে হবে, তাবিজের তাপমাত্রা মাপতে হবে। গ্রাফে প্লট করতে হবে।"

টিটন বলল, "ঠিক আছে প্লট কর। কিন্তু সাবধান–"

"কী?"

"নাপাক অবস্থায় তাবিজটা ধরবি না।"

চঞ্চল বলল, "ঠিক আছে। ধরব না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কোথায় পেয়েছিস এই তাবিজ?"

টিটন চোখ বড় বড় করে বলল, "তোর লাগবে?"

"না, লাগবে না। আমি শুধু জানতে চাইছি কোথায় পেয়েছিস?"

"রাস্তার ধারে একজন লোক বিক্রি করছে। মহা কামেল মানুষ। সবকিছুর জন্যে তাবিজ আছে। ভূত, জিন থেকে শুরু করে বিয়ে-শাদি, বিছানায় পিশাব, ব্যবসা-বাণিজ্য এমন কী জিপিএ ফাইভের জন্যেও তাবিজ আছে।"

"কত করে দাম?"

"অষ্ট ধাতুর তাবিজটা সবচেয়ে ভালো, কিন্তু সেটার অনেক দাম। আমি সস্তারটা কিনেছি। ছোট বলে আমাকে অর্ধেক দামে দিয়েছে। মাত্র বিশ টাকা!"

আমি আর চঞ্চল একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম, শুধু টিটনের পক্ষেই এরকম জিনিস বিশ্বাস করা সম্ভব।

টিটন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা মিশকাত মঞ্জিল কখন যাব?"

"আয় সবাই মিলে ঠিক করি।"

"এখন?"

"উহুঁ।" চঞ্চল মাথা নাড়ল, বলল, "এখন না। এইবার গেলে আমরা দেয়ালটা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকব। সেই জন্যে আমাদের সবকিছু নিয়ে রেডি হয়ে যেতে হবে।"

"সবকিছু কী কী নিতে হবে?

"এই মনে কর শাবল, হাতুড়ি, টর্চ লাইট, দড়ি, ম্যাচ, মোমবাতি, ব্যাটারি, তার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, কম্পাস, কাগজ, কলম, মেজারিং টেপ, টুল বক্স, করাত, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন,–"

টিটন অবাক হয়ে বলল, "এতো কিছু কেন?"

"ভিতরে কী আছে তো আমরা জানি না। কখন ফোনটা দরকার লাগবে কে বলতে পারে? সেজন্যে সবকিছু নিয়ে যেতে হবে।"

"ও।" টিটন সব কিছু বুঝে ফেলেছে এরকম ভঙ্গী করে মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, "আয় আগে একটা বড় লিস্ট করি তারপর লিস্টটা ভাগাভাগি করে আমরা চারজনকে দিয়ে দিই। সবাই মিলে জিনিসগুলো রেডি করব।"

চঞ্চল মাথা নেড়ে লিস্ট তৈরি করতে লেগে গেল।

প্রথম লিস্টটা হলো অনেক বড়। সেই লিস্টের সবকিছু নিতে হলে আমাদের আস্ত একটা ট্রাক লেগে যাবে। তাই প্রথম লিস্টটা কাটছাট করে দ্বিতীয় লিস্টটা করা হলো। দেখা গেল তার সবকিছু নিতে হলে একটা টেম্পো লাগবে। তখন সেই লিস্টটা আরো কাটছাট করা হলো আর তখন সেটা দেখে মনে হলো এবারে সবকিছু আমরা মোটামুটি নিজেরাই আমাদের ব্যাক পেক করে নিয়ে যেতে পারব। তখন আমরা লিস্টটা ভাগাভাগি করে ঠিক করে নিলাম কে কোনটা জোগাড় করবে। অনু এখনো আসে নি তাই সবচেয়ে কঠিন কঠিন জিনিসগুলো জোগাড় করার দায়িত্বটা দিলাম তার ঘাড়ে।

চঞ্চল তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। মিশকাত মঞ্জিলের ভেতরে ঢোকার জন্যে আরো কী কী যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হবে, সে সেগুলো তৈরি করছে। তাই আমি আর টিটন বের হলাম অনুর লিস্টটা নিয়ে, সেইটা অনুর কাছে পৌঁছে দেব।

টুনিদের বাসার সামনে দিয়ে যখন মাঠটা পার হচ্ছি তখন দেখতে পেলাম টুনি আর মিথিলা বাসার সামনে নাচ প্র্যাকটিস করছে, তবে এমনিতে মেয়েরা যে রকম করে নাচে সে রকম নাচ না–অন্য রকম নাচ। আমাদের দেখে তারা থেমে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী করছিস?"

টুনি বলল, "কিছু না।"

মিথিলা বলল, "আপু আমাকে কারাটে শিখাচ্ছে।"

টিটন চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি কারাটে জান নাকী?"

"এই একটু একটু। ঢাকায় শিখতাম।"

আমি বললাম, "আমাদের দেখাবে?"

"এটা তো দেখানোর জিনিস না। কোনো একদিন যদি আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে চাও তাহলে হয়তো একটু ব্যবহার করা যাবে।"

আমার মনে পড়ল, প্রথম দিন টিটন টুনিকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছিল, মনে হচ্ছে টুনি সেটা ভোলেনি।

মিথিলা বলল, "টুনি আপু আসলে ব্ল্যাক–"

টুনি মিথিলাকে কথাটা শেষ করতে দিল না, থামিয়ে দিয়ে বলল, "ব্ল্যাক ড্রাগন।"

"হ্যাঁ, ব্ল্যাক ড্রাগন।" মিথিলা মাথা নাড়ল, "ব্ল্যাক ড্রাগন।"

টুনি বলল, "তোরা কী ঠিক করেছিস আমাদের দলে আসবি কী আসবি না?"

টিটন মুখ শক্ত করে বলল, "এর মাঝে ঠিক করার কিছু নাই। তোরা আমাদের ব্ল্যাক ড্রাগন দলটা হাইজ্যাক করে নেয়ার চেষ্টা করছিস! তোদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা দরকার। হাইকোর্টে কেস করা দরকার।"

টুনি বলল, "হাইকোর্টে কেস করতে হবে না। আয় অন্য একটা কাজ করি।"

"কী কাজ?"

"ব্ল্যাক ড্রাগন নামটা আমার আর মিথিলার। তোরা চারজন ব্ল্যাক ড্রাগনের বাংলা নামটা নে।"

আমি রেগে গিয়ে বললাম, "কী বললি? বাংলা নাম?"

"হ্যাঁ।" টুনি হাসি হাসি মুখ করে বলল, "ব্ল্যাক এর বাংলা হচ্ছে কালা আর ড্রাগনের বাংলা যেন কী হবে?"

টিটনটা গাধার মতো বলল, "গুইসাপ।"

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "মোটেও গুইসাপ না।" কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে মিথিলা হাততালি দিয়ে বলতে লাগল, "কালা গুইসাপ! কালা গুইসাপ!!"

টুনি হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "তোদের জন্যে একেবারে ঠিক

নাম। তোরা চারজন গুইসাপের মতো মুখ ভোতা করে মাটির সাথে গড়িয়ে গড়িয়ে আস্তে আস্তে যাবি। আর আমরা যাব ড্রাগনের মতো।"

আমি রেগে গিয়ে বললাম, "খবরদার, আমাদের কালা গুইসাপ বলবি না।"

টুনি বলল, "আমরা তো বলতে চাই না। আমরা তো সবাই মিলেই ব্ল্যাক ড্রাগন করতে চাই। তোরাই তো রাজি হচ্ছিস না।"

টিটন বলল, "কক্ষনো রাজি হব না।"

আমিও বললাম, "কক্ষনো রাজি হব না।"

টুনি বলল, "ঠিক আছে তাহলে।"

মিথিলা বলল, "কালা গুইসাপ! কালা গুইসাপ!!"

চোখ দিয়ে আগুন বের করে কাউকে পুড়িয়ে মারা সম্ভব হলে মিথিলা তখনই পুড়ে ছাই হয়ে যেতো।

অনুদের বাসায় পৌঁছানোর পরেও আমি আর টিটন রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলাম। অনুর আম্মু যখন আমাদের খাবার জন্যে কিছু ভালো ভালো নাশতা দিলেন সেগুলো খেয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হলো। পৃথিবীর সব মেয়েরা যদি অনুর আম্মুর মতো এরকম ভালো হতো তাহলেই তো পৃথিবীতে কোনো সমস্যা থাকত না। কেউ কেউ মিথিলার মত, টুনির মত বের হয়ে যায় সে জন্যই তো এতো সমস্যা!

রাত্রিবেলা বাসায় আমরা খেতে বসেছি তখন মিথিলা আব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "আব্বু ড্রাগন বাংলা কী?"

আব্বু বললেন, "ড্রাগন তো একটা কাল্পনিক প্রাণী, তার বাংলা নাম আছে বলে মনে হয়ে না।"

"গুইসাপ ড্রাগনের বাংলা হয় না?"

"করলেই হয়। তাবে গুইসাপ হচ্ছে এক ধরনের সরীসৃপ। রেপটাইল।" আব্বু খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? হঠাৎ করে ড্রাগনের দরকার হলো কেন?"

মিথিলা মুচকি মুচকি শয়তানী হাসি দিতে দিতে বলল, "এমনি।"

আব্বু তখন খেতে খেতে আম্মুর সাথে কথা বলতে লাগলেন,

জিনিসপত্রের দাম নিয়ে কথা বললেন, রাজনীতি নিয়ে কথা বললেন, দুর্নীতি নিয়ে কথা বললেন, অসুখবিসুখ নিয়ে কথা বললেন, শুনতে শুনতে একটু পরেই আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। হঠাৎ করে "মিশকাত মঞ্জিল" কথাটা শুনে আমি সোজা হয়ে বসি। শুনলাম, আব্বু বলছেন, "মিশকাত মঞ্জিল নিয়ে অনেক দিন ধরে মামলা চলছিল মনে আছে? মামলার রায় হয়েছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মিশকাত মঞ্জিল নিয়ে কে মামলা করছিল?"

"মিশকাত খানের নাতি-পুতিরা।"

"এখন কী হবে?"

"যারা মামলায় জিতেছে, তারা এসে দখল নেবে।"

"দখল নিয়ে কী করবে?"

"শুনেছি পুরোটা ভেঙ্গে ফেলবে। ভেঙ্গে সেখানে মার্কেট বানাবে।"

"কখন ভাঙ্গবে?"

"সেটা তো জানি না।"

মিথিলা মুচকি মুচকি শয়তানী হাসি দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া, তুমি মিশকাত মঞ্জিল নিয়ে এতো কিছু জানতে চাও কেন?"

"আমার ইচ্ছা। তোর কী?"

"আমার কিছু না। কিন্তু এই রকম একটা ভূতের বাড়ি সেই জন্যে জিজ্ঞেস করছি।"

"ভূতের বাড়ি হয়েছে তো কী হয়েছে?"

"না কিছু হয় নাই।" মিথিলা আবার মুচকি মুচকি শয়তানী হাসি হাসতে থাকে। আমার কেন জানি সন্দেহ হয় যে মিথিলা মনে হয় জেনে গেছে আমরা মিশকাত মঞ্জিলে ঢুকব। কিন্তু কেমন করে জানল?

আমি বুঝতে পারলাম আমাদের খুব তাড়াতাড়ি মিশকাত মঞ্জিলের অভিযানটা করে ফেলতে হবে তা না হলে বিশাল ঝামেলা হয়ে যাবে। এডভেঞ্চার করার আগেই যদি মিশকাত মঞ্জিলটা ভেঙ্গে ফেলে তখন কী হবে?

৬.

পরদিন খুব সকালবেলা পেয়ারাগাছের উপরে আমাদের একটা জরুরি সভা বসেছে। সবাই হাজির হওয়ার পর আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "আব্বু বলেছেন মিশকাত মঞ্জিল নিয়ে মামলা চলছিল, এখন কোর্টের রায় হয়েছে।"

চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "কোর্টের রায় হলে কী হয়?"

"যারা মামলায় জিতেছে তারা এসে এখন মিশকাত মঞ্জিল ভেঙ্গে ফেলবে। সেখানে মার্কেট বানাবে।"

অনু বলল, "মার্কেট? ছিঃ!"

চঞ্চল বলল, "মার্কেট বানালে আমাদের কী?"

"আমাদের কিছু না। কিন্তু মিশকাত মঞ্জিলটা ভেঙ্গে ফেললে আমরা তো আর তার ভিতরে ঢুকতে পারব না! তাই আমাদের আগেই সেখানে ঢুকতে হবে।"

টিটন হাত নেড়ে বলল, "ইয়েস ! তাবিজ লাগানোর পর আর আমার ভয় করছে না। চল আমরা এখনই যাই।"

চঞ্চল বলল, "যাওয়ার আগে আমাদের দেখতে হবে লিস্টের সবকিছু আছে কী না।"

আমি বললাম, "কালকে সবাইকে আমি লিস্ট দিয়েছি। সবাই কি তোদের লিস্টের জিনিসগুলো জোগাড় করেছিস?"

অনু মাথা চুলকে বলল, "আমার লিস্টটা খুবই কঠিন। এখনো সবকিছু জোগাড় হয় নি।"

"কী কী জোগাড় হয় নি?"

"যেমন মনে কর কবুতর--"

টিটন বলল, "আমরা কবুতর দিয়ে কী করব?"

চঞ্চল বলল, "বিজ্ঞানী হতে হলে প্রথমেই কী শিখতে হয় বল।"

টিটন বলল, "অংক মুখস্থ করা।"

চঞ্চল বলল, "না। প্রথমে শিখতে হয় সেফটি। যেন কোনো একসিডেন্ট না হয়। কেউ ব্যথা না পায়। ইলেকট্রিক শক না খায়। গ্যাস দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ না হয়।

"মিথ্যা কথা বলবি না।" টিটন গর্জন করে বলল, "আমাকে তুই কাল ইলেকট্রিক শক দিয়েছিলি। আমি অনেক ব্যথা পেয়েছিলাম।"

"সেটা দিয়েছিলাম মজা করার জন্যে।"

"মজা করলে কী মানুষ ব্যথা পায় না?"

অনু বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে! যেটা জিজ্ঞেস করেছিস তার উত্তর আগে শুনি। কবুতর কেন?"

চঞ্চল বলল, "মিশকাত মঞ্জিলের গোপন কুঠুরির ভিতরে আমরা কী দেখেছিলাম মনে আছে? একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।"

আমরা মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ।"

"আমাদের সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে। তার মানে বুঝতে পেরেছিস?"

"কী?"

"নিচে বছরের পর বছর কেউ যায় নাই। হয়তো সেখানে বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়ে আছে। আমরা নামতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাব। সেজন্যে যদি খাঁচায় ভরে একটি কবুতর সেখানে নামিয়ে দিয়ে দেখি সেটা মারা যাচ্ছে না তাহলে বুঝতে পারব সেখানে বিষাক্ত গ্যাস নাই।"

আমরা চঞ্চলের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি একটু চিন্তা করে বললাম, "কিন্তু কবুতর না পাঠিয়ে যদি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নামিয়ে দেই, সেটা যদি জ্বলতে থাকে তাহলে বুঝব অক্সিজেন আছে, নিঃশ্বাস নিতে পারব।"

চঞ্চল মাথা নাড়ল, বলল, "না। অনেক সময় মিথেন গ্যাস জমা হয়। তাহলে আগুন জ্বালালেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়ে সারা মিশকাত মঞ্জিল উড়ে যাবে। সাথে সাথে আমরাও। কাজেই আগে কবুতর।"

টিটন বলল, "তোদের বাসায় তো কবুতর আছে। তুই একটা ধরিস না কেন?"

অনু বলল, "কবুতর রাত্রে ধরে রাখতে হয়। দিনেরবেলায় সব উড়ে

চলে যায়। এখন আর ধরা যাবে না।"

টিটন বলল, "ঠিক আছে। আজ রাত্রে ধরে রাখবি।"

অনু মাথা নাড়ল, "রাখাব। ধরে রাখব।"

আমি বললাম, "তাহলে কাল ভোরে মিশকাত মঞ্জিল অভিযান।"

সবাই মাথা নাড়ল।

"আজকে সবাই লিস্ট ধরে সবকিছু জোগাড় করবি।"

সবাই আবার মাথা নাড়ল।

"কাউকে কেউ কিছু বলতে পারবি না।"

সবাই আবার আরো জোরে মাথা নাড়ল।

চঞ্চল বলল, "আয় আমরা এখন মিশকাত মঞ্জিলটা একটু দেখে আসি।"

টিটনের চোখটা উজ্জ্বল উয়ে উঠল, বলল, "কী দেখবি?"

"বাইরে থেকে ঘুরে দেখে আসি বিল্ডিংটা কতো বড়, কোনদিকে কতটুকু। আমরা যখন ভিতরে ঢুকব তখন যেন আন্দাজ থাকে কোথায়, কোনদিকে আছি।"

আমরা তখন গাছ থেকে নেমে মিশকাত মঞ্জিলের দিকে হেঁটে যেতে থাকি। কাছাকাছি পৌঁছে এদিক-সেদিক তাকালাম, যখন দেখলাম আশেপাশে কেউ নেই, কেউ আমাদের দেখছে না, তখন আমরা শুট করে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। সকালবেলা বলেই হয়তো অনেক পাখি কিচিরমিচির করছে। আমরা মিশকাত মঞ্জিলটা ভালো করে দেখলাম, চঞ্চল একটু মাপজোক করল, টিটন বুক ফুলিয়ে বলতে লাগল সে আর ভূতকে ভয় পায় না। আমরা চাইলে সে এখন একাই ভিতরে ঢুকে যেতে পারে!

খানিকক্ষণ বিল্ডিংয়ের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে আমরা যখন বের হয়ে আসছি তখন দেখলাম গেটের কাছে একটা মোটর সাইকেল দাঁড় করানো সেখানে পাহাড়ের মত বড় একজন মানুষ বসে আছে। মানুষটার ওজনে মোটর সাইকেলের চাকা যে ফেটে যাচ্ছে না, সেটাই আশ্চার্য। আরেকজন শুটকো মানুষ সেই একই মোটর সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। মানুষগুলোর চেহারার মাঝে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মাঝে এমন একটা কিছু আছে যেটা দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। দেখেই বোঝা যায় মানুষগুলো ভালো না।

যে মানুষটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল সে দাঁত খোঁচানো বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকালো, তারপর পিচিক করে রাস্তায় থুতু ফেলে বলল, "এই যে খোকারা।"

আমরা মোটেও খোকা না, আমাদেরকে কেউ খোকা বলবে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু সেটা নিয়ে তর্ক করা যায় না, তাই তর্ক না করে আমরা দাঁড়ালাম। অনু বলল, "আমাদেরকে বলছেন?"

গুটকো মানুষটা হাসার ভাঙ্গি করে বলল, "এইখানে তোমরা ছাড়া আর কে আছে? আর কাকে বলব?"

কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচানোর জন্যেই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক মানুষটার দাঁতগুলোর মাঝে অনেক বড় ফাঁক। তার মাঝে দিয়ে জিবটাকে দেখা যায়–জিবের মাঝে কালো কালো ফুটকি, এরকম আমি আগে কখনো দেখি নি। মানুষটা তার ফুটকি ফুটকি জিব বের করে সেটা দিয়ে তার ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে বলল, "তোমরা এইখানে কেন ঢুকেছ?"

টিটন বলল, "ঢুকলে কী হয়?"

"এইখানে তো কেউ ঢুকে না, তাই জানতে চাচ্ছি। মানুষজন ভয় পায়। তোমরা তো পোলাপান মানুষ, তোমরা কেন ভয় পাও না?"

"মানুষজন কী ভয় পায়?'

"এই তো ভূত-প্রেত!"

টিটন তার সার্টের হাতা তুলে তার বিশাল তাবিজটা দেখিয়ে বলল, "এই যে আমার এই তাবিজটা আছে। ভূত আমার ধারেকাছে আসে না।"

"অ।" মানুষটা আবার কাঠি দিয়ে তার দাঁত খোঁচাতে শুরু করে, দেখে মনে হয় আমাদের সাথে তার কথা বুঝি ফুরিয়ে গেছে। আমরা যেই হাঁটতে শুরু করেছি তখন সে আবার থামাল "কিন্তু তোমরা তো আমাকে বললে না কেন এইখানে ঢুকেছ।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। এই মানুষটি কেন বারবার আমাদের জিজ্ঞেস করছে আমরা কেন ভিতরে ঢুকেছি? মানুষটাকে বিশ্বাস করানোর মতো উত্তর পাওয়া কঠিন। আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই অনু মুখ খুলল, বলল, "ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে।"

"কিসের ছাতা?"

"ব্যাঙের ছাতা।"

"ব্যাঙের ছাতা? কেন?"

"আমাদের বিজ্ঞান স্যার আমাদেরকে একটা সায়েন্স প্রজেক্ট দিয়েছেন। ব্যাঙের ছাতার উপর। সেই জন্যে আমাদের ব্যাঙের ছাতা দরকার। কয়দিন থেকে আমরা সব জায়গায় ব্যাঙের ছাতা খুঁজছি। শেষ পর্যন্ত এইখানে পেয়েছি।"

"অ।" মানুষটা আবার তার দাঁত খোঁচাতে থাকে।

"ব্যাঙের ছাতা আসলে এক ধরনের ফাংগাস!" এবারে চঞ্চল যোগ দিল, "আমাদের দেশে অনেক রকম ব্যাঙের ছাতা আছে। অনেক ব্যাঙের ছাতা খাওয়া যায়, যেরকম মাশরুম। সেগুলো চাষও করে। ব্যাঙের ছাতা হওয়ার জন্যে দরকার একটু অন্ধকার একটু স্যাঁতসেঁতে জায়গা। অনেক ব্যাঙের ছাতা আছে খুব বিষাক্ত, কেউ যদি একটু খায় তাহলেই মরে যাবে। অনেক ব্যাঙের ছাতা আছে যেগুলো খেলে মারা যাবে না, কিন্তু নেশা হবে। সেজন্যে ব্যাঙের ছাতা চেনা দরকার। আমরা সেইজন্যে ব্যাঙের ছাতা নিয়ে গবেষণা করব..."

মোটর সাইকেলের সামনে পাহাড়ের মতন যে মানুষটা বসে ছিল সে মনে হয় চঞ্চলের বক্তৃতা শুনে বিরক্ত হয়ে গেল। সে বলল, "আবে মাইনকা। এই প্যাঁচাল শুনে লাভ নাই। আয় যাই।"

মানুষটি যে রকম মোটা তার গলার স্বর ঠিক সে রকম। শুধু মোটা না তার শরীরটা পাহাড়ের মতো, টাইট একটা টি-সার্ট পরেছে আর সেই টি-সার্টের ভিতর দিয়ে তার শরীরটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হয় তার শরীরে মাংশপেষী জীবন্ত প্রাণীর মতো কিলবিল কিলবিল করছে। সে যদি হাত দিয়ে একটা ঝটকা দেয় তাহলে মনে হয় আমরা চারজন চারদিকে ছিটকে পড়ব।

মানুষটা তার গমগমে গলায় বলল, "এই মাইনকা, ওঠ, আয় যাই।"

"চল ওস্তাদ।" বলে মাইনকা, যার আসল নাম মনে হয় মানিক মোটর সাইকেলের পিছনে উঠল। পাহাড়ের মতো মানুষটা মোটর সাইকেল স্টার্ট করে চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ছেলে। শোন।"

চঞ্চল বলল, "কী হলো?"

"কথা কম বলবা। বুছেঝ? কথা বেশি বললে মানুষ বিরক্ত হয়। আর মানুষ বিরক্ত হলে একদিন তোমারে ধরে পাটকান দিয়ে ফেলে দিবে।

বুঝেছ?"

চঞ্চল বলল, "পাটকান মানে কী?"

"জিজ্ঞেস কর না। তাহলে যদি দেখায়া দেই তাহলে তোমার খবর হয়ে যাবে। যাও, বাড়ি যাও!" বলে মানুষটা একটা ধমকের ভঙ্গি করল।

লোক দুইজন মোটর সাইকেল চালিয়ে চলে যাবার পর চঞ্চল বলল, "দুইটা মানুষকে ইনডাকশন কয়েল দিয়ে ইলেকট্রিক শক দেওয়া দরকার। কত বড় বেয়াদপ।"

বেয়াদপ মানুষ দুইটা নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে আসতে লাগলাম। বাসার কাছাকাছি এসে দেখি পেয়ারা গাছে টুনি আর মিথিলা পা ঝুলিয়ে বসে আছে। এর আগে মিথিলাকে কোনোদিন গাছে উঠতে দেখি নি, আজই প্রথম। টুনির সাথে থেকে থেকে তার অনেক উন্নতি হয়েছে মনে হয়। আমি বললাম, "মিথিলা, গাছে উঠেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"পড়ে ঠ্যাং ভাঙলে বুঝবি মজা।"

"ভাঙলে ভাঙবে।"

টুনি বলল, "আসলে এখানে ব্ল্যাক ড্রাগনের জরুরি মিটিং হচ্ছে।"

আমরা বললাম "অ।"

শুধু যে আমাদের নাম ব্ল্যাক ড্রাগন দখল করে আছে তা না, আমাদের পেয়ারা গাছটাও দখল করে নিয়েছে। আমরা তাই হেঁটে হেঁটে চঞ্চলের বাসার দিকে যেতে থাকি। পিছন থেকে মিথিলা বলল, "কালা গুইসাপ! কালা গুইসাপ!!"

কথাটা শুনে চঞ্চলের কোনো ভাবান্তর হলো না, অনু হেসে ফেলল, তার করা অনুবাদটা ব্যবহার হচ্ছে সেই আনন্দেই মনে হয়, টিটন একটা গর্জন করল আর আমার মনে হলো মিথিলাকে আমি নিশ্চয়ই একদিন খুন করে ফেলব। পত্রিকায় খবর বের হবে, 'মর্মান্তিক: বড় ভাইয়ের হাতে ছোট বোনের মৃত্যু।' শুধু আসল খবরটা কেউ জানতে পারবে না।

আমাদের বাকি দিনটা কেটে গেল পরের দিনের অভিযানের প্রস্তুতি নিতে নিতে। লিস্টটা বিশাল, সব মিলিয়ে তেপান্নটা আইটেম। সবচেয়ে বড় আইটেম হচ্ছে শাবল আর সবচেয়ে ছোট হচ্ছে টুথ পিক। চঞ্চল লিস্টের

পাশে তারকা চিহ্ন দিয়েছে, কোনো কোনোটা তিন তারকা যার অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ–যেমন শাবল, হাতুড়ি, চাকু, দড়ি, টর্চ লাইট, ম্যাচ, মোমবাতি, কবুতর এইগুলো। কোনো কোনোটা তারকা চিহ্ন বিহীন যার অর্থ কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন : কমিক বই, এ.এম রেডিও, এনার্জী সেভিং বাল্ব, আঠা আর রাবারব্যান্ড। এগুলো কেন তালিকায় আছে আমরা সেটাই বুঝতে পারলাম না! চঞ্চলকে কিছু বলি নি কিন্তু শুরুতেই আমরা এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছি।

চঞ্চলের ল্যাবরেটরিতে বসে আমরা লিস্টটা দেখে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, কাল ভোরে যখন আমরা এগুলো নিয়ে রওনা দিব তখন সবাই চোখ কপালে তুলে বলব, তোরা এই বাক্স প্যাটরা নিয়ে কোথায় রওনা দিয়েছিস? সবচেয়ে ঝামেলা হবে শাবলটা নিয়ে, ভারী একটা শাবল ঘাড়ে নিয়ে টেনে টেনে যাচ্ছি দৃশ্যটাই কাউকে বোঝানো যাবে না।

আমি বললাম, "কাল সকালের জন্যে না রেখে শাবলটা আজকেই মিশকাত মঞ্জিলে রেখে আসি।"

অনু মাথা নাড়ল, বলল, "গুড আইডিয়া।"

"যদি কেউ জিজ্ঞেস করে শাবল নিয়ে কই যাচ্ছি, আমরা কী বলব?"

টিটন বলল, "আমরা কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ভেংচে দেব। আমাদের কী ঠ্যাকা পড়েছে যে সবার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে?"

আমাদের বাসা থেকে মরচে ধরা শাবলটা নিয়ে যখন বের হয়েছি তখন মিথিলা জানতে চাইল, "ভাইয়া, শাবল নিয়ে কই যাও।"

আমি উত্তর না দিয় মুখ ভেংচে দিলাম, তখন মিথিলা নাকী সুরে আম্মুকে নালিশ করতে লাগল, "আঁম্মু ভাঁইয়া আঁমাকে মুঁখ ভ্যাংচায়।"

আম্মু চলে আসার আগে আমি বের হয়ে গেলাম। ভারী শাবলটা নিয়ে যখন আমরা রাস্তা ধরে যাচ্ছি তখন অনেকেই সন্দেহের চোখে তাকাল কিন্তু কেউ কিছু প্রশ্ন করল না। মিশকাত মঞ্জিলের কাছে গিয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে যখন ভিতরে ঢুকে গেছি তখন চমকে উঠে আবিষ্কার করলাম সেখানে ফুটকি জিব মানিক আর তার পাহাড়ের মতো ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছে। শুধু যে আমরা চমকে উঠলাম তা নয়, তারাও আমাদের দেখে চমকে উঠল। ফুটকি জিব মানিক জিজ্ঞেস করল, "তোমরা এখানে কী কর?"

এক সেকেন্ড দেরি না করে চঞ্চল বলল, "ব্যাঙের ছাতা তুলে নিতে এসেছি।"

ছোট একটা ব্যাঙের ছাতা তুলতে এতো বড় একটা শাবল লাগে কী না তারা ইচ্ছা করলেই সেই প্রশ্নটা করতে পারত, কিন্তু করল না। এবারে আমি একটা সাহসের কাজ করে ফেললাম, জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা এখানে কী করেছেন?"

আমি ভেবেছিলাম লোকগুলো ধমক দিয়ে বলবে, "তোমার সেটা জানার দরকার কী?" কিন্তু তা না করে তারা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, ফুটকি জিব বলল, "না, মানে ইয়ে আমরা তো রিয়েল স্টেটে কাজ করি, সেই জন্য মানে–ইয়ে–"

পাহাড়ের মতো মানুষটা তখন ধমক দিয়ে বলল, "আবে মাইনকা। প্যাঁচাল পারিস না। আয় যাই।"

মানিক বলল, "চলেন।" তারপর দুইজন বের হয়ে গেল।

অনু বলল, "খুবই সন্দেহের ব্যাপার।"

আমি বললাম, "মনে নাই, আব্বু বলেছিলেন মিশকাত মঞ্জিল নিয়ে মামলা হয়েছে। এরা মনে হয় হারু পার্টি। মামলায় হেরে গিয়ে এখন কেমন করে দখল করবে সেটা চিন্তা করছে।"

চঞ্চল মাথা নাড়ল, বলল, "মনে হয় তাই হবে।"

টিটন বলল, "যারা মামলা করতে চায় করুক, আমরা আমাদের কাজ করি।"

"হ্যাঁ। আমরা আমাদের কাজ করি।"

"এই শাবলটা কোথায় লুকিয়ে রেখে যাবি?"

"দোতলার সেই ঘরটাতে রেখে এলেই হয়।"

টিটন বলল, "দে। রেখে আসি। তোরা অপেক্ষা কর।"

"তোর ভয় করবে না তো?"

টিটন দাঁত বের করে হাসল, "ধুর! ভয় করবে কেন?" তার বিশাল তাবিজটা দেখিয়ে বলল, "এই তাবিজ আছে না আমার?"

ভারী শাবলটা ঘাড়ে নিয়ে টিটন মিশকাত মঞ্জিলের ভিতরে ঢুকে যায়। চঞ্চল আমাকে আর অনুকে ডেকে বলল, "একটা জিনিস তোদের বলি। কাউকে বলবি না তো?"

"বলব না।"

"খোদার কসম?"

"খোদার কসম।"

"মনে আছে, টিটন আমাকে তার তাবিজটা দিয়ে গিয়েছিল, ধরে রাখলে গরম হয় সেটা পরীক্ষা করার জন্যে?"

আমি মাথা নাড়লাম,"মনে আছে।"

চঞ্চল বলল, "তাবিজটা মোম দিয়ে বন্ধ করা। গরম করে মোম গলিয়ে আমি ভিতরের সবকিছু বের করেছিলাম।"

"তাই নাকি? কী আছে ভিতরে?"

"ছোট একটা কাগজে হাবিজাবি লেখা। আমি কী করেছি জানিস?"

"কী করেছিস?"

"হাবিজাবি কাগজটা ফেলে নতুন একটা কাগজ ঢুকিয়ে মোম দিয়ে ভরাট করে দিয়েছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। কাগজটাতে কী লেখা জানিস?"

"কী?"

"আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র, ই ইকুয়েলস টু এম সি স্কয়ার।"

আমি আর অনু হি হি করে হাসলাম। অনু বলল, "তোর বৈজ্ঞানিক তাবিজ আগের থেকে ভালো কাজ করছে!"

"হ্যাঁ। টিটনটা যে কী বোকা।"

আমরা দেখলাম আমাদের টিটন শাবলটা রেখে মিশকাত মঞ্জিল থেকে বের হয়ে আসছে তাই তাবিজ নিয়ে আলোচনাটা থামিয়ে দিলাম। টিটন এসে বলল, "কী অসাধারণ তাবিজ! এখন আর একটুও ভয় করে না।"

আমরাও মাথা নাড়লাম, বললাম, "অসাধারণ!"

৭.

সকালবেলা আমরা পেয়ারা গাছের নিচে আমি টিটন আর চঞ্চল একত্র হয়েছি। অনু এখনো আসে নি সে সবসময়েই দেরি করে আসে। মোটাসোটা মানুষেরা মনে হয় সবকিছুই আস্তে ধীরে করে। অনু পৌঁছলেই রওনা দিয়ে দেব, তার জন্যে অপেক্ষা করছি। এতো সকালে কোথায় যাই সেটা নিয়ে আমাদের বাসায় কেউ তেমন কিছু বলে নি। আগেও এরকম অনেকবার হয়েছে--বাসার সবাই মেনে নিয়েছে যে আমরা মাঝে মাঝে এরকম ছোটখাট পাগলামি করি। আমাদের বাসায় শুধু মিথিলা খুব ভোরে উঠে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া, কই যাও?"

আমি আমার অভ্যাস মতো খেঁকিয়ে উঠলাম, "সেটা তোর জানার দরকার কী?"

ভেবেছিলাম আমার ধমক খেয়ে মিথিলা নাকী সুরে আম্মুকে নালিশ করে দেবে, আঁম্মু দেঁখো, ভাঁইয়া আঁমাকে বঁকা দিঁচ্ছে কিন্তু কী কারণ কে জানে, সে নালিশ করল না। শুধু যে নালিশ করল না তা মনে হলো একটু মিচকি হাসি দিল! কেন নালিশ না করে মিচকি হাসি দিল আমি এখন আর সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

অনু কেন এতো দেরি করে আসছে আমরা যখন সেটা নিয়ে তাকে বকাবকি করছি তখন দেখলাম সে হেলতে দুলতে আসছে। পিঠে বিশাল ব্যাক পেক। হাতে একটা খাঁচা সেখানে সাদা রঙের একটা কবুতর। আমরা গরম হয়ে বললাম, "এতো দেরি করে এসেছিস কেন?"

অনু আরো গরম হয়ে বলল, "সকালবেলা খাঁচার ভিতর একটা কবুতর হাতে নিয়ে রওনা হয়ে দেখ সকাল সকাল আসতে পারিস কী না। হেন-ত্যানো একশটা প্রশ্ন।"

"তুই কী বলেছিস?"

"বলেছি আমরা কবুতরের পায়ে লাগিয়ে চিঠি পাঠানো যায় কীনা

সেটা পরীক্ষা করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।"

চঞ্চল বলল, "ভেরিগুড। খুবই ভালো উত্তর দিয়েছিস।"

টিটন বলল, "অনুর মতো বানিয়ে বানিয়ে আর কেউ বলতে পারে না। মনে নাই, সেই দিন ব্যাঙের ছাতার গল্পটা বলেছিল?"

আমি বললাম, "বড় হয়ে লেখক হবে তো, সেই জন্যে এখন থেকেই গুলপট্টি মারা প্র্যাকটিস করছে।"

চঞ্চল বলল, "আয় রওনা দেই।"

"চল।" আমরা রওনা দিলাম।

আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে, মিশকাত মঞ্জিলে গিয়ে যদি দেখি ফুটকি জিব মানিক আর তার ওস্তাদ মিঃ পাহাড় ঘোরাঘুরি করছে, তাহলে একটা মহা ঝামেলা হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের কপাল ভালো এতো সকালে সেখানে কেউ নাই, শুধু পাখিগুলো কিচিরমিচির করছে। আমরা তাড়াতাড়ি গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আমাদের ঘরটাতে ঢুকে গেলাম। আমরা ব্যাক পেকগুলো পিঠ থেকে খুলে নিচে রেখে দিই, টিটন আগাছার মাঝে লুকিয়ে রাখা শাবলটা বের করে আনল।

আমি বললাম, "মনে আছে ঐ দিন একটা বেজি বের হয়েছিল? ভিতরে বেজি থাকে মনে হয়।"

চঞ্চল বলল, "হ্যাঁ।"

"আজকেও যদি ভেতরে থাকে?"

"একটু শব্দ করি তাহলেই পালিয়ে যাবে।"

আমরা শাবল দিয়ে দেয়ালে এখানে সেখানে ঘা দিলাম তখন সত্যি সত্যি প্রথমে একটা বড় বেজি তারপর দুইটা ছোট বেজি গর্ত দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে গেল। অনু বলল, "বেজি পরিবার সুখী পরিবার।"

চঞ্চল বলল, "আহা বেচারা, আমরা তাদের বাড়িটা নষ্ট করে ফেলব। এখন আর সুখী পরিবার থাকবে না।"

আমি বললাম, "এখানে অনেক জায়গা আছে, বেজি পরিবার থাকার জন্যে অনেক জায়গা পেয়ে যাবে।"

টিটন জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় গর্তটা করব?"

চঞ্চল বলল, "যেখানে ছোট গর্তটা আছে সেখান দিয়েই শুরু করি।"

টিটন তখন শাবলটা দিয়ে সেখানে জোরে একটা ঘা দিল, সাথে সাথে

একটা ইট খুলে এলো। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। দেখতে দেখতে একজন মানুষের ঢোকার মতো একটা গর্ত হয়ে গেল। চঞ্চল হাত তুলে বলল, "এখন থাম।"

অনু ইতস্তত করে বলল, "গর্তটা আরেকটু বড় কর।"

আমাদের মনে পড়ল অনু আমাদের তুলনায় বেশ নাদুস-নুদুস–আমরা ঢুকে যেতে পারলেও সে আটকে যাবে। টিটন তখন দুই পাশ থেকে আরো দুটি ইট খুলে ফেলল।

চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "কে আগে ঢুকবি?"

টিটন বলল, "আমি। আমার কাছে তাবিজ আছে, আমার কোনো ভয় নাই।"

আমি অনু আর চঞ্চল একজন আরেকজনের দিকে তাকলাম, টিটন যদি তার তাবিজের রহস্যটা জানত তাহলে সে কী করত কে জানে!

চঞ্চল বলল, "ঠিক আছে, তুই আগে ঢোক। তোর ব্যাগটা বাইরে থাকুক। টর্চ লাইটটা নিয়ে যা, ভেতরে গিয়ে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে চারদিক দেখে আমাদের জানা। যদি অস্বাভাবিক কিছু দেখিস তাহলে বের হয়ে আসবি।"

টিটন বলল, ঠিক আছে। তারপর তার হাতে বাঁধা তাবিজটা একবার চুমু দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ডুকে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী অবস্থা? ভিতরে কিছু আছে?"

টিটন বলল, "মাকড়শার জাল। আর ভোঁটকা গন্ধ।"

"আর কিছু?"

"মাটিতে গাছ পাতা, মনে হয় এটা বেজির বাসা।"

"আর কিছু?"

"দুইটা বাদুর উড়ছে।"

চঞ্চল বলল, সাবধান, "বাদুর যেন না কামড়ায়। বাদুরের মাঝে র‍্যাবিজ ভাইরাস থাকে।"

"আমাকে কামড়াবে না। আমার তাবিজ আছে।"

"বাদুর তো জানে না, তোর তাবিজ আছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম " ভিতরে আর কী আছে?"

"সামনে একটা ঘোরানো সিঁড়ি। নিচে নেমে গেছে।"

চঞ্চল বলল, "গুড। আগে তোর ব্যাগটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিই। নে ধর।"

আমরা ঠেলে টিটনের ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিলাম।

আমি বললাম, "এবারে আমি ঢুকি?"

"ঠিক আছে।"

আমি প্রথমে আমার ব্যাগটা ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে নিজে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলাম। টিটন ঠিকই বলেছে ভেতরে একটা ভোঁটকা গন্ধ। কিসের গন্ধ কে জানে। আমি টর্চ লাইট জ্বালিয়ে একটু এগিয়ে সিঁড়িটার দিকে তাকালাম। একটা লোহার সিঁড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচে অন্ধকার, কী আছে দেখা যায় না।

আমি আর টিটন যখন টর্চ লাইট জ্বালিয়ে নিচে নেমে যাওয়া সিঁড়িটা দেখছি তখন ছোট গর্তটা দিয়ে প্রথমে কবুতর আর দুটি ব্যাগ ঢুকিয়ে দিল তারপর অনু আর চঞ্চলও ঢুকে গেল। আমরা চারজন এখন গাদাগাদি করে ছোট একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সবার হাতেই একটা করে টর্চ লাইট, ছোট ঘরটাকে সেটা বেশ ভালোভাবে আলোকিত করে রেখেছে। বাদুরগুলো আলোর কারণে খুবই ঝামেলায় পড়েছে মনে হয়, খানিকক্ষণ উড়ে শেষে গর্ত দিয়ে বের হয়ে গেল।

চঞ্চল এবার তার কাজ শুরু করে দেয়। প্রথমে চিকন লাইলনের একটা দড়ি দিয়ে কবুতরের খাঁচাটাকে বাঁধল। তারপর সেই খাঁচাটা আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে দিতে থাকে। মাঝামাঝি যাবার পর হঠাৎ সেটা ডানা ঝাপটে ওঠে, আমরা সবাই চমকে উঠলাম। টিটন জিজ্ঞেস করল, "মরে গেছে নাকী?"

আমি বললাম, "না।"

চঞ্চল আবার কবুতরটা নিচে নামাতে থাকে। সেটা আবার এক-দুইবার ডানা ঝাপটে উঠল, একবার মনে হয় ভয় পেয়ে একটু ডেকেও উঠল। কবুতরটা যখন একেবারে নিচে নামানো হলো আমরা দেখলাম সেটা খাঁচার ভেতরে হাঁটাহাঁটি করছে। তার মানে এখানে বিষাক্ত কোনো গ্যাস নেই।

চঞ্চল বলল, "এবারে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে খুব আস্তে আস্তে নামাতে থাকি। যদি মিথেন গ্যাস থাকে তাহলে আগুন ধরে যাবে। তাহলে

আমরা নিচে নামব না।"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিক আছে।"

আমরা একটা বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে তার মাঝখানে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিচে নামাতে শুরু করলাম। আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম, হঠাৎ যদি ভক করে আগুন ধরে একটা বিস্ফোরণ হয় তাহলে আমরা কী করব? ঐ ছোট গর্ত দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে বের হতে পারব?

কিন্তু কোনো বিস্ফোরণ হলো না, মোমবাতিটা বেশ ভালোভাবেই জ্বলতে লাগল। চঞ্চল তখন সন্তুষ্টির ভান করে বলল, "ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নাই।"

আমি বললাম, "চল নামি।"

"চল।"

"কে আগে?"

টিটন বলল, "আমি।" তাবিজের কারণে এখন তার অনেক সাহস, অনেত মজা।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। প্রথমে টিটন তারপর চঞ্চল তারপর অনু সবার শেষে আমি। লোহায় মরচে ধরা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সেটা অল্প অল্প দুলতে থাকে, হঠাৎ করে সেটা ভেঙ্গে পড়বে কী না সেটা নিয়ে আমার একটু দুশ্চিন্তা লাগতে থাকে। সাবধানে আস্তে আস্তে পা ফেলে আমরা যখন মাঝামাঝি এসেছি তখন আমার হঠাৎ মনে হলো আমি যেন একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মনের ভুল মনে করে আরো দুই পা নামার পর আমি আবার সেই শব্দটা শুনলাম, হাততালি দেবার মতো শব্দ। আমি চাপা গলায় বললাম, "চুপ! সবাই চুপ!"

আমার গলার স্বরে নিশ্চয়ই কিছু একটা ছিল–একসাথে সবাই চুপ করে গেল। চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "কী?"

আমি কাঁপা গলায় বললাম, "একটা শব্দ।" আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথে সেই হাততালি দেওয়ার মতো শব্দটা আবার শোনা গেল। আমরা সবাই তখন একসাথে চমকে উঠি।

চঞ্চল বলল, "সবাই টর্চ লাইট নিভিয়ে ফেল।"

কেন টর্চ লাইট নিভাতে হবে আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সবাই নিভিয়ে ফেললাম। সাথে সাথে ঘুটঘুটে অন্ধকারে পুরোটুকু ঢেকে

গেল।

আবার হাততালির শব্দ শুনতে পেলাম তার সাথে মেয়ে কণ্ঠে একটু কান্নার শব্দ। টিটন কাঁপা গলায় বলল, "ইয়া মাবুদ।"

আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকি তখন আবার কান্নার শব্দটা শুনতে পেলাম। আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমার মনে হতে লাগল এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্যাঁচানো একটা লোহার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা আমরা চারজন ছাড়া আশে পাশে আরো কেউ আছে। আমরা তার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ করে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল, আর আমরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম খিলখিল করে হাসতে হাসতে কিছু একটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, হঠাৎ করে লোহার সিঁড়িটা ঝনঝন শব্দ করে কাঁপতে থাকে। আমি ভয়ে চিৎকার করে আমার টর্চ লাইটটা জ্বালালাম এবং সাথে সাথে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর জমে গেল।

বীভৎস কুৎসিত একটা মুখ লোহার সিঁড়িটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় চোখ, লাল ঠোঁটের ফাঁকে কালো জিব, লম্বা লম্বা দাঁত, মাথায় শনের মতো চুল। ভয়ঙ্কর জীবটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগোতে থাকে। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে অনুর গায়ের ওপর দিয়েই নিচে নামার চেষ্টা করতে থাকি। টিটন আর চঞ্চলও সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাবার চেষ্টা করে, ভয়াবহ আতঙ্কে একটা ছুটাছুটি শুরু হয়ে যায়।

ঠিক তখন উপর থেকে খিলখিল করে হেসে একজন পরিষ্কার গলায় বলল, "কী হলো? তোরা এতো ভয় পাচ্ছিস কেন?"

আমরা উপরে তাকালাম। টুনি উপরে দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগে যে ভয়ঙ্কর বীভৎস মুখটি দেখেছিলাম সেটা আসলে একটা মুখোশ, টুনি সেই মুখোশটা খুলে হাতে ধরে রেখেছে। শুধু টুনি নয় আমরা দেখলাম টুনির পিছনে মিথিলাও আছে। পাজী মেয়েটা মুখে হাত দিয়ে খিলখিল করে হাসছে।

টুনির ওপর প্রচণ্ড রাগে আমাদের ফেটে পড়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা কেউই রেগে উঠলাম না। এই ভয়ঙ্কর আতঙ্কটা আসলে সত্যি নয় সে জন্যেই আমরা সবাই টুনিকে মনে মনে মাফ কর দিয়েছি। কিন্তু সেটা তো আর

বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, তাই খুব রেগে যাবার ভান করে আমি বললাম, "এটা কী রকম ঠাট্টা?"

টুনি বলল, "আই অ্যাম সরি। এই দেখ আমি কান ধরছি–" সত্যি সত্যি সে নিজের কান ধরল তারপর মিথিলার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুইও ধর।" তখন মিথিলাও কান ধরল, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আর কখনো এরকম করব না! মোটেও বুঝতে পারি নি তোরা এত ভয় পাবি।"

টিটন বলল, "ভয় পাবার কী আছে? আমার কাছে তাবিজ আছে না? হঠাৎ দেখে শুধু একটু চমকে উঠেছিলাম।" পরিষ্কার মিথ্যা কথা, আমরা সবাই যা ভয় পেয়েছিলাম সেটা আর বলার মতো না। এখনো আমাদের সবার বুক ধুকধুক করছে।

টুনি বলল, "ভয় না পেলে ভালো। খুবই ভালো।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোরা এখানে এলি কেমন করে? কেমন করে বুঝতে পারলি আমরা এখানে?"

"আমরা হবিছ ব্ল্যাক ড্রাগন। আমরা সবকিছু পারি।"

"ফাজলেমি করবি না। সত্যি করে বল।"

টুনি খিলখিল কর হেসে উঠল। বলল, "খুবই সোজা! তোর ব্যাগে দেখ একটা মোবাইল টেলিফোন আছে। সকালবেলা যখন ঘর থেকে বের হচ্ছিলি তখন মোবাইলটা আমার টেলিফোনে ডায়াল করে কানেকশন নিয়ে তারপর রেখে দেয়া হয়েছে। সেই কাজে সাহায্য করেছে কমরেড মিথিলা। তারপর আমরা ঘরে বসে তোদের সব কথা শুনেছি। পানির মতো সোজা।"

টুনির বুদ্ধি দেখে আমি বেকুব হয়ে গেলাম। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলাম না। আমি বললাম, "তুই এসেছিস তো এসে গেছিস? সাথে ওই মিথিলাকে নিয়ে এসেছিস কেন? এখন এইখানে ভয় পাবে, কান্নাকাটি করবে।"

মিথিলা বলল, "কখনো ভয় পাব না। কান্নাকাটি করব না। তোমরা ভয় পেয়েছ।"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ ভয় পেয়েছি। এরকম জায়গায় পড়লে যে কেউ ভয় পাবে।"

চঞ্চল বলল, "ব্যস! অনেক হয়েছে। চল আমরা নিচে নামতে শুরু করি।"

টুনি বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের দলে আমরা দুজনও আছি। কালা গুইসাপের সাথে ব্ল্যাক ড্রাগন!"

আমরা এখন আর সেটা নিয়ে নতুন করে ঝগড়া শুরু করলাম না। টুনি বলল, "তোরা চিন্তা করিস না। আমরা আমাদের ব্যাগে করে অনেক ভালো ভালো খাবার এনেছি।"

অনু জিজ্ঞেস করল, "কী খাবার?"

"কোল্ড ড্রিংকস, স্যান্ড উইচ, চীপস, চকলেট, আপেল।"

অনু হাতে কিল দিয়ে বলল, "ভেরি গুড।"

আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে টুনির উপর যেটুকু রাগ ছিল খাবারের কথা শুনে সেই রাগটুকুও উবে গের।

আমরা আবার নিচে নামতে শুরু করি। টুনি বলল, "তোদের কবুতর দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস আছে কী নেই সেটা দেখায় বুদ্ধিটা একেবারে ফাটাফাটি।"

আমি বললাম, "আমাদের সব বুদ্ধিই ফাটাফাটি। সাথে থাক তাহলেই দেখবি।"

"আমরা তো সাথে থাকতেই চাই, তোরাই না হিংসুটের মতো আমাদের দলে নিতে চাস না।"

কথাটা সত্যি তাই আমি আর কিছু বললাম না।

টিটন প্রথমে নিচে নামল, তারপর টর্চ লাইট দিয়ে চারদিক দেখে বলল, "খুবই আজব জায়গা।"

আমরাও যখন নিচে নেমে এসেছি তখন বুঝতে পারলাম আজব জায়গা বলতে সে কী বোঝাচ্ছে। আমাদের ধারণা ছিল আমরা বুঝি নিচে নেমে একটা হলঘরের মতো জায়গা পাব। কিন্তু আসলে নিচে কোনো ঘর নেই, নিচে একটা সুড়ঙ্গের মতো। সিঁড়ির নিচ থেকে সুড়ঙ্গটা শুরু হয়ে সেটা এদিক-সেদিক চলে গেছে। দেখে মনে হয় একটা গোলকধাঁধা।

চঞ্চল বলল, "আগেই কেউ রওনা দিস না। সত্যি যদি এটা গোলকধাঁধা হয় তাহলে একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসতে পারব না।"

টুনি বলল, "আমাদের কাছে দুইটা মোবাইল টেলিফোন আছে।"

চঞ্চল মাথা নেড়ে বলল, "মাটির তলায় নেটওয়ার্ক থাকার কথা না।

তবু চেষ্টা করে দেখ।"

আমার ব্যাক পেকে লুকিয়ে রাখা মোবাইল ফোন আর টুনির মোবাইল ফোনটা বের করে পরীক্ষা করা হল, দেখা গেল চঞ্চলের অনুমান সত্যি। আসলেই নেটওয়ার্ক নেই।

টিটন জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কী করব?"

"এই সিঁড়িটার সাথে দড়িটা বেঁধে দড়ি ধরে ধরে এগিয়ে যাই, তাহলে যদি হারিয়েও যাই, দড়ি ধরে ধরে আবার ফিরে আসতে পারব।"

টুনি বলল, "গুড আইডিয়া।"

আমি বললাম, "এইখানে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে যাই তাহলে আলোটা দেখেও আসতে পারব।"

চঞ্চল বলল, "ঠিক বলেছিস।"

কাজেই লোহার সিঁড়িটাতে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে আমরা দড়ি ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যাই। সরু একটা সুড়ঙ্গ একজন মানুষ কষ্ট করে যেতে পারে। মাথা নিচু করে যেতে হয়, মাঝে মাঝে উপরে মাথা লেগে যায়। সুড়ঙ্গের দেয়ালটা ইট এবং পাথরের, কষ্ট করে এটা তৈরি করা হয়েছে। মাঝে মাঝে চুন দিয়ে আঁকি-বুঁকি করা, রহস্যময় একটা পরিবেশ।

সুড়ঙ্গের মাঝে ঠাণ্ডা। বিচিত্র শ্যাওলার মতো একটা গন্ধ। আমরা নিঃশব্দে একজনের পিছনে আরেকজন হেঁটে যেতে থাকি। সুড়ঙ্গটা আসলেই গোলকধাঁধা, সোজা যেতে যেতে হঠাৎ দেখা যায় ডান ও বাম দিকে দুটো সুড়ঙ্গ। ডান দিকে কিছু দূর গেলে আবার সেটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ দিয়ে কিছুদূর গেলে দেখা যায় সেটা আবার কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তার কোনো একটা দিয়ে গেলে দেখা যায় আমরা হঠাৎ করে আগের জায়গায় ফিরে এসেছি। ভারী বিচিত্র একটা ব্যাপার। এটা কে তৈরি করেছিল, কেন তৈরি করেছিল কিংবা কীভাবে তৈরি করেছিল কে জানে!

সুড়ঙ্গ ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা যখন ধরেই নিয়েছি এখানে এই সুড়ঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই তখন হঠাৎ করে আমরা একটা খাড়া দেয়ালের সামনে হাজির হলাম। সেখানে একটা কাঠের দরজা। সেই দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলছে।

আমরা সবাই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তালাটা দেখে একটু অবাক হয়ে সেটার দিকে তাকলাম। তালাটা ধরে একটু টানাটানি করে আমরা হাল ছেড়ে দিই। এতো বড় তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। কাঠের দরজাটাও একেবারে পাথরের মতো শক্ত। কতোদিন থেকে এটা এখানে আছে কিন্তু কিছু হয়নি। মনে হয় আরো শক্ত হয়েছে।

চঞ্চল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "চাবি ছাড়া এই তালা খুলে ভিতরে ঢোকা যাবে না।"

মিথিলা তখন পিছন থেকে বলল, "এই যে চাবি।"

আমরা চমকে উঠে বললাম, "চাবি?"

"হ্যাঁ।" মিথিলা এগিয়ে এসে আমাদের দিকে দুইটা চাবি এগিয়ে দেয়, একটা একটু বড়, আরেকটা ছোট। আমি অবাক হয়ে বললাম, "চাবি কোথায় পেলি?"

"সুড়ঙ্গের মাঝখানে এক জায়গায় দেয়ালে ঝোলানো ছিল আমি খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছিলাম।"

টুনি মিথিলার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "ভেরি গুড, কমরেড মিথিলা।"

আমরাও মাথা নাড়লাম, বললাম, "ফ্যান্টাস্টিক।" মিথিলা যে নাকী সুরে আম্মুকে নালিশ করা ছাড়াও অন্য কাজ করতে পারে এই প্রথম আমি তার একটা প্রমাণ পেলাম।

টিটন চাবি দুইটা নিয়ে তালার ভিতরে ঢোকায়। একটা বেশি ছোট অন্যটা ভিতরে ঠিকভাবে ঢুকে গেল। বহু বছর ব্যবহার না করার কারণে তালাটা প্রথমে খুলতে চাইল না। চঞ্চল তখন তার ব্যাক পেক খুলে সেখান থেকে একটা শিশি বের করে সেটা থেকে খানিকটা তেল তালাটার ভিতরে ঢেলে দেয় তারপর কয়েকবার তালাটা নাড়াচাড়া করে চাবিটা ভিতরে ঢুকিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করতেই সেটা ঘটাং করে খুলে গেল। বিশাল তালাটা দরজার কড়া থেকে খুলে নিচে রেখে আমরা দরজাটা ধাক্কা দিলাম, তখন ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে যায়।

আমরা টর্চ লাইট দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। ভেতরে বেশ বড় একটা ঘর। এর ছাদটাও বেশ উঁচু। ঘরটার দেয়ালটা নকশি কাটা। আমরা সামনের দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে মনে হলো আমরা সবাই পাথরের মতো জমে গেছি।

ঘরের মাঝখানে একটা বড় সিন্দুক। সিন্দুকের উপরে একটা কঙ্কাল। কঙ্কালটা ছোট, দেখে বোঝা যায় কম বয়সী কোনো বাচ্চার। শরীরের কাপড়টা এতো দিনে ক্ষয়ে গেছে, তবু বোঝা যায় এক সময়ে বাচ্চাটিকে লাল কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা ছিল। কঙ্কালটার ছোট ছোট হাতে সোনার চুড়ি। পায়ে সোনার নূপুর। মাথায় সোনার একটা টিকলি। নাকের নাকফুল আর কানের দুলগুলো খুলে পড়ে আছে।

দৃশ্যটি এতো ভয়ানক যে আমরা চিৎকার করতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। শুধু মিথিলা আতঙ্কে একটা চাপা শব্দ করে টুনিকে জড়িয়ে ধরল। টুনি মিথিলাকে ধরে ফিসফিস করে বলল, "ভয় নাই। কোনো ভয় নাই মিথিলা।"

অনু আস্তে আস্তে বলল, "যক্ষ"।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী বললি?"

"এই সিন্দুকে নিশ্চয়ই অনেক ধন-রত্ন আছে। এই ধন-রত্ন পাহারা দেবার জন্যে এই বাচ্চাটাকে খুন করে রেখে গেছে। সে যক্ষ হয়ে ধন-রত্ন পাহারা দিচ্ছে।"

মিথিলা ভয়ে ভয়ে বলল, "সত্যি?"

"রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে এরকম একটা গল্প আছে, সম্পত্তি-সমর্পণ। যক্ষ হয়ে ধন-রত্ন পাহারা দেয়।"

মিথিলা ভয়ে ভয়ে বলল, "এখন যদি কেউ এই ধন-রত্ন ধরে তাহলে কী হবে?"

"যক্ষ কাউকে ধরতে দিবে না। কেউ ধরলে যক্ষ তাকে মেরে ফেলবে।"

মিথিলা বলল, "চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

আমরা সিন্দুকটি ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিথিলার মতো আমাদেরও মনে হচ্ছে এখান থেকে আমরা চলে যাই। সিন্দুকের উপর ছোট একটা বাচ্চার কঙ্কাল—এই দৃশ্যটি এতো ভয়ানক যে সেটার দিকে তাকানো যায় না। সবচেয়ে ভয়ানক তার হাতের ছোট ছোট সোনার চুড়ি। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় এই ছোট মেয়েটা বুঝি এক্ষুনি তার সোনার চুড়িগুলো নাড়িয়ে উঠে বসে আমাদের দিকে তাকাবে, বলবে, তোমরা এতোদিন পরে এসেছ? যখন এখানে আমাকে খুন করে সিন্দুকের উপর শুইয়ে রেখেছিল তখন কেউ আসতে পারলে না? আমাকে বাঁচাতে

পারলে না?

চঞ্চল আস্তে আস্তে বলল, "আমাদের কাছে সিন্দুকটার চাবি আছে। ইচ্ছে করলে আমরা সিন্দুকটা খুলে দেখতে পারি ভিতরে কী আছে।"

মিথিলা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "না। দেখতে চাই না।"

আমরাও মাথা নাড়লাম, বললাম, "থাকুক। আমরা বাইরে গিয়ে বড় মানুষদের বলি, তারা এসে এটা খুলুক।"

চঞ্চল হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোরা যক্ষের ভয় পাচ্ছিস?"

"না, ঠিক তা না। কিন্তু–" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

টুনি বলল, "আসলে ছোট একটা বাচ্চার কঙ্কাল দেখে খুব খারাপ লাগছে। সিন্দুকটা খুলতে হলে কঙ্কালটাকে সরাতে হবে। আমাদের কারো সেটা করতে ইচ্ছে করবে না।"

অনু মাথা নাড়ল, বলল, "টুনি ঠিকই বলেছে।"

চঞ্চল বলল, "ঠিক আছে। তাহলে ক্যামেরাটা দিয়ে কয়েকটা ছবি তুলে আমরা যাই।"

চঞ্চল ক্যামেরা বের করে বেশ কয়েকটা ছবি তুলল, তারপর সেটা ব্যাগের ভিতরে রেখে বলল, "চল যাই।"

আমি বললাম, "চল।"

ঠিক তখন ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে দরজাটা খুলে গেল, ভারী গলায় একজন বলল, "আগেই চলে যেও না। দাঁড়াও।"

আমরা চমকে উঠে সামনের দিকে তাকালাম, দরজায় মানিক আর তার পাহাড়ের মতো ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছে। মানিকের হাতে একটা ছোট রিভলবার, সেটা আমাদের দিকে তাক করে রেখেছে। ওস্তাদের হাতে একটা শাবল, আমরা যেটা উপরে রেখে এসেছিলাম। ভারি শাবলটা সে এমনভাবে ধরেছে যেন এটা একটা পাটকাঠি!

৮.

পাহাড়ের মতো মানুষটা ভেতরে ঢুকে আমাদের সবাইকে এক নজর দেখে বলল, "দেখছিস মাইনকা, চার গোলামের সাথে এখানে দুই বিবি যোগ হইছে।"

প্রথমে আমার মনে হলো আমাদের গোলাম বলে গালি দিচ্ছে, একটু পরে বুঝতে পারলাম সে তাসের গোলাম আর বিবির কথা বলছে। আমরা কিছু বললাম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাহাড়ের মতো মানুষটা ঘরের ভেতরে ঢুকে এদিক-সেদিক তাকাল। তারপর শাবলটা দিয়ে চঞ্চলের পেটে খোঁচা দিয়ে বলল, "কী, পেয়েছিস ব্যাঙের ছাতা? ব্যাঙের ছাতার জন্যে মাটির এতো নিচে আসতে হলো?"

আমরা এবারেও কোনো কথা বললাম না। মানিক বলল, "আমি প্রথম যখন এই চার মক্কেলকে দেখেছি তখনি বুঝেছি কোনো গোলমাল আছে। মনে আছে ওস্তাদ, কী রকম চোখের পাতি না ফেলে মিথ্যা কথা বলে গেল? এরা যখন বড় হবে তখন কতো বড় ক্রিমিনাল হবে চিন্তা করতে পারেন?"

মোটা মানুষটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এই জন্যেই তো দেশের উন্নতি হয় না। ছোট পোলাপান ছোট পোলাপানের মতো থাকে না, বড় মানুষের কাজের মাঝে নাক গলায়।"

আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কী চান?"

প্রথমে মানিক তারপর পাহাড়ের মতো মানুষটা হা হা করে হাসতে থাকে যেন আমি খুবই হাসির কথা বলেছি। এক সময় হাসি থামিয়ে মানিক বলল, "আমরা দুজন এখানে এসেছি আপনাদের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য! আপনারা এই রকম কামেল মানুষ আমরা যদি আপনাদের অটোগ্রাফ না নেই তাহলে কে নিবে?"

মোটা মানুষটা বলল, "আচ্ছা দেখি, তোরাই বলতে পারিস কী না! বল দেখি আমরা কী জন্যে এসেছি?"

আমি অনুমান করতে পারছিলাম কিন্তু সেটা প্রকাশ করলাম না।

বললাম, "জানি না।"

মানুষটা তার শাবলটা দিয়ে সিন্দুকটা দেখিয়ে বলল, "ঐ যে সিন্দুকটা দেখছিস না? তার ভিতর কী আছে বল দেখি?"

আমরা সেটাও অনুমান করতে পারছিলাম কিন্তু মুখে বললাম, "জানি না।"

"ঐ সিন্দুকের ভিতর আছে সাত রাজার ধন! মিশকাত খানের সাথে কাজ করতো ডাকাতের দল। তার ছিল কয়েকটা দোনলা বন্দুক। সে ডাকাতদের সেই দোনলা বন্দুক দিত ডাকাতি করার জন্যে। তারা ডাকাতি করে সোনাদানা আনতো, মিশকাত খান তার বখরা নিত। সব সে এই সিন্দুকে রেখে গেছে।"

চঞ্চল জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন করে জানেন?"

"মিশকাত খানের ডান হাত ছিল গজু ডাকাত! আমি হচ্ছি গজু ডাকাতের ছেলের ঘরের নাতি। আমি যখন ছোট তখন আমার বাপ-চাচা আমার কাছে গল্প করেছে, বলেছে মিশকাত মঞ্জিলের নিচে আছে যক্ষের ধন। এই হচ্ছে সেই যক্ষের ধন। আমি ছয় বছর ধরে খুঁজেছি পাই নাই! তোরা সবাই একসাথে তিনদিনে খুঁজে পেয়ে গেলি। তোদের একটা পুরস্কার দেয়া দরকার! বল দেখি তোদেরকে কী পুরস্কার দিব?"

চঞ্চল বলল, "জানি না।"

"তোদের সাথে একজনের পরিচয় করিয়ে দিব, তোদের বন্ধু। তারপর তোরা মিলেমিশে থাকবি।"

মানুষটা কী বলছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, চঞ্চল বলল, "বন্ধু? কোন বন্ধু?"

পাহাড়েরর মতো মানুষটা তখন সিন্দুকের উপর শুয়ে থাকা বাচ্চাটার কঙ্কালটাকে দেখিয়ে বলল, "এই যে তোদের বন্ধু! আরেকজন বিবি! চার গোলাম দুই বিবি ছিলি, এখন হবি চার গোলাম তিন বিবি!" এই ঘরে সবাই মিলে থাকবি। গল্প-গুজব করবি। যখন রাত হবে তখন নাকী সুরে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াবি।"

মানুষটার কথা শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল, কী ভয়ানক কথা বলছে! আমাদের এখানে আটকে রাখবে! আমি মিথিলার দিকে তাকালাম, ভেবেছিলাম দেখব ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কিন্তু ঠিক কি কারণ জানা নেই, তাকে দেখে মনে হলো না সে খুব ভয় পেয়েছে। সে টুনির হাত

ধরে রেখে শান্ত মুখে মানুষগুলোকে দেখছে।

মানিক আমাদের দিকে রিভলবারটা ধরে রাখল, আর তার পাহাড়ের মতো ওস্তাদ লোহার শাবলটা ঘাড়ে নিয়ে সিন্দুকটা ঘুরে একটা চক্কর দেয়। তারপর মুখ দিয়ে লোল টানার মতো শব্দ করে বলল, "আমার আর সহ্য হচ্ছে না। সিন্দুকটা খুলি। মাইনকা টর্চ লাইটটা এদিকে ধর।"

চঞ্চল বলল, "আমাদের কাছে মোমবাতি আছে। লাগবে আপনাদের?"

"মোমবাতি?" পাহাড়ের মতো মানুষটার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "আগে বলবি তো? টর্চ লাইট ধরে কী কাজ করা যায়? বার কর মোমবাতি।"

চঞ্চল কেন গায়ে পড়ে মানুষগুলোকে সাহায্য করতে চাইছে অন্য কেউ সেটা বুঝতে পারল না, শুধু আমি বুঝতে পারলাম। সে তার ইনডাকশন কয়েলটা বের করতে চাইছে।

মানিক রিভলবারটা চঞ্চলের দিকে তাক করে রেখে বলল, "খবরদার কোনো রকম রং তামাশা করবি না। ভদ্রলোকের মতো মোমবাতিটা বের করবি।"

চঞ্চল তার ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করার ভান করে অনেক কিছু বের করল, তার ইনডাকশন কয়েলটাও। সেখান থেকে মোমবাতিগুলো আলাদা করে মানিকের হাতে দেয়, তারপর বের করা জিনিসগুলো আবার ব্যাগের ভেতর ঢোকাতে থাকে। আমি চোখের কোণা দিয়ে লক্ষ্য করলাম সে অন্য জিনিসগুলো ব্যাগে ঢোকালেও ইনডাকশন কয়েলটা ঢোকালো না। আমি তখন চঞ্চলকে সাহায্য করার জন্য মানিকের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করলাম। তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনারা তো সিন্দুক খুলে সোনাদানা পাবেন। আমরা কি এখন যেতে পারি?"

মানিক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বললি?"

"বলছি যে আমরা কী এখন যেতে পারি?"

"কোথায় যাবি?"

"বাসায়।"

"বাসায়?" আমার কথা শুনে মানিক এতো অবাক হলো যে বলার মতো নয়। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "তোর মাথায় কী গোবর না কী অন্য কিছু? তুই কেমন করে ভাবলি যে আমরা তোদের ছেড়ে দিব? তোদেরকে ছেড়ে দিলে তোরা যে বাইরে গিয়ে খবর দিবি আর পুলিশ, র‍্যাব, মিলিটারী এসে আমাদেরকে ধরবে সেটা তোর মোটা মাথায় ঢুকে না?"

অবশ্যই ঢুকে কিন্তু আমি যে তার দৃষ্টি আমার দিকে রাখার জন্যে কথাগুলো বলছি সেটা তো আর বলতে পারছি না। তাই আমি আলাপ চালিয়ে যাবার জন্যে বললাম, "ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে সোনাদানার একটু ভাগ দেন তাহলে আমরা কাউকে বলব না।"

"কী বললি?" মানিক আমার কথা শুনে এবারে শুধু অবাক নয় মনে হয় রেগেও গেল। বলল, "তোদের সোনাদানার ভাগ দিব?"

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, "কেন দিবেন না? আমরাই তো এই জায়গাটা খুঁজে বের করেছি।"

মানিক তখন পাহাড়ের মতো মানুষটার কাছে নালিশ করল, বলল, "শুনছেন ওস্তাদ এই পোলা কী বলে? তারে নাকি সোনাদানার ভাগ দিতে হবে।"

"এদের কথা শুনিস না মাইনকা। এরা মেলা ত্যাঁদর। এদের কথা শুনলে কানের পোকা নড়ে যায়।"

এতক্ষণে চঞ্চল নিশ্চয়ই ইনডাকশন কয়েলটা তার হাতে লাগিয়ে ফেলেছে আমি তাই আর কথা বললাম না। পাহাড়ের মতো মানুষটা মোমবাতিগুলো ঘরের এদিক-সেদিকে রেখে সেগুলো জ্বালিয়ে দেয়। সাথে সাথে ঘরের ভিতর একটা নরম আলো ছড়িয়ে পড়ে। টর্চ লাইটটা নিভিয়ে পাহাড়ের মতো মানুষটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সিন্দুকের চাবি কার কাছে?" টিটন তার হাতের চাবিটা এগিয়ে ধরে, মোটা মানুষটা এসে ছোঁ মেরে চাবিটা নিয়ে নেয়।

পাহাড়ের মতো মানুষটা বলল, "এখন আমি এই সিন্দুকের তালা খুলব। তোরা কোনো গোলমাল করবি না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। চোরের গুষ্ঠি চোর।"

আমার কেমন জানি রাগ উঠে গেল, বললাম, "চুরি করতে এসেছেন আপনারা, আর আমাদেরকে বলছেন চোর?"

মানিক তখন হঠাৎ যেন খেপে গেল, চোখ পাকিয়ে বলল, "কী বললি? কী বললি তুই? আমরা চুরি করতে এসেছি? তোর এতো বড় সাহস, তুই আমাদের চোর ডাকিস?" মানিক রাগে দাঁত কিড়মিড় করে রিভলবারটা আমার মাথার দিকে তাক করে, আমি দেখতে পেলাম সে রিভলবারের ট্রিগারটা টেনে ধরেছে, যে কোনো মুহূর্তে একটা গুলি বের হয়ে আসবে।

তখন অত্যন্ত বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল, মিথিলা ছুটে এসে মানুষটার

হাত ধরে হ্যাচকা টানে সরিয়ে আনল আর ঠিক তখন রিভলবার থেকে একটা গুলি বের হয়ে আসে। ছোট ঘরটাতে প্রচণ্ড শব্দে সেটি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মিথিলা মানুষটার হাত ধরে ঝুলে থাকে, কিছুতেই ছাড়ে না। মানিক ঝটকা মেরে মিথিলাকে সরানোর চেষ্টা করে, পারে না। তখন সে বাম হাত দিয়ে মিথিলার ঘাড়টা ধরে তাকে টেনে সরায়। তারপর মিথিলার বুকের কাছে ফ্রকটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এই ছেমড়ি? তোর কী মাথা খারাপ হয়েছে? এক ঘুষিতে আমি যদি তোর সবগুলো দাঁত না ফালাই তাহলে আমার নাম মাইনকার বাচ্চা মাইনকা না।"

আমি তখন আমার জীবনের সবচেয়ে বিচিত্র দৃশ্যটি দেখতে পেলাম। টুনি দুই হাত উপরে তুলে হিংস্র গলায় বলল, "এই যে মাইনকার বাচ্চা মাইনকা সাহেব, বাচ্চা মেয়েটারে ছাড়েন। আর যদি সাহস থাকে তাহলে আমার কাছে আসেন।"

মানিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, সে বিস্ফারিত চোখে টুনির দিকে তাকাল, বলল, "কী বললি?"

টুনি কিছু না বলে এক আঙুল দিয়ে মানিককে নিজের দিকে ডাকে। মানুষ পথে ঘাটে কুকুর কিংবা বিড়ালের বাচ্চাকে যেভাবে ডাকে, অনেকটা সে রকম। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম টুনির সারা শরীর ইস্পাতের তারের মতো টান টান হয়ে গেছে, সে তার দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গি করে দুলতে থাকে।

মানিক এবারে মিথিলাকে ছেড়ে দেয় তারপর রিভলবারটা টুনির দিকে তাক করে এগিয়ে আসে। হঠাৎ করে মনে হলো ঘরের মাঝে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমরা দেখলাম টুনি ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়, তার পা শূন্যে উড়ে যায়, আমরা কিছু বোঝার আগে দেখলাম টুনি তার পা দিয়ে মানিকের মুখের মাঝে প্রচণ্ড জোরে লাথি মেরে বসেছে। একজন মানুষের পা যে এত উপরে উঠতে পারে সেটা নিজের চোখে না দেখলে আমরা বিশ্বাস করতাম না। মানিক একটা আর্ত চিৎকার করে ঘুরে পড়ে যায়। সে এখনো বুঝতে পারছে না কি হয়েছে। আমরা মানিকের দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম তখন টুনি চিৎকার করে আমাদের থামাল, বলল, "তোরা সব যা।"

বিড়াল যেভাবে ইঁদুরের বাচ্চা ঘিরে ঘুরতে থাকে, টুনি এখন ঠিক সেভাবে মানিককে ঘিরে ঘুরতে থাকে। মানিক তার রিভলবারটা তুলে ধরে, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি সে এখন গুলি করে বসবে কিন্তু তার আগেই টুনি

বিদ্যুৎ চমকানোর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমরা দেখতে পেলাম তার একটা লাথিতে হাত থেকে রিভলবারটা উড়ে গিয়ে নিচে পড়েছে। টিটন তখন ছুটে গিয়ে রিভলবারটা নিজের হাতে তুলে নিল।

টুনি নাচের ভঙ্গিতে মানিককে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে বলল, "মানিকের বাচ্চা মানিক সাহেব, দুই হাত পিছনে নিয়ে মাটিতে উপড় হয়ে শুয়ে পড়ুন তা না হলে আপনার দুটি দাঁত এক্ষুণি খুলে যাবে। আমি ফোর্থ ডিগ্রী ব্ল্যাক বেল্ট। আমাকে দেখে মনে না হতে পারে কিন্তু খালি হাতে আমি আপনার মতো দুই-চারজনকে খুন করে ফেলতে পারি।"

মানিক টুনির কথা বিশ্বাস না করে দুর্বল ভাবে ওঠার চেষ্টা করল, আর সাথে সাথে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো টুনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি দেখলাম সাথে সাথে মানিক হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, আর ওঠার সাহস পেল না।

টিটন তখন রিভলবারটা তুলে পাহাড়ের মতো মানুষটার দিকে তাক করে ধরেছে, চিৎকার করে বলছে, "হ্যান্ডস আপ।"

পাহাড়ের মতো মানুষটার মুখ দেখে মনে হলো সে এখনো পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস করছে না। সে অবাক হয়ে একবার টুনির দিকে আর একবার টিটনের দিকে তাকাল, তার পর বলল, "কী বললি? হ্যান্ডস আপ? এই বান্দরের বাচ্চা তুই হ্যান্ডস আপ মানে জানিস?"

টিটন কোনো কথা না বলে রিভলবারটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পাহাড়ের মতো মানুষটা তখন টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই নিজেকে কী ভাবিস? ফিল্ম স্টার? মাইনকা হচ্ছে মাজাভাঙা টিবি রোগী! তার সাথে মাইরপিট করে তোর সাহস বেড়েছে? আয় তাহলে আমার কাছে–তোর ফিলমি কায়দা আমার সাথে কর! তোর কলজে যদি আমি ছিড়ে না ফেলি তাহলে আমি বাপের ব্যাটা না।"

টিটন বলল, "হ্যান্ডস আপ। যদি আপনি হ্যান্ডস আপ না করেন গুলি করে দিব।"

মানুষটা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "তুই গুলি কর! দেখি তোর গুলি আমার চামড়া ফুটা করতে পারে কী না। কর গুলি।"

টিটন গুলি করল না, শুধু চিৎকার করে বলল, "হ্যান্ডস আপ। না হলে গুলি করে দিব।"

মানুষটা হঠাৎ এগিয়ে এসে খপ করে টিটনের হাতটা ধরে রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে বলল, "এই ছেমড়া, তোর রিভলবারকে আমি ভয় পাই?"

মানুষটা রিভলবারটাকে তার কোমরে গুঁজে বলল, "আমার সাথে রংবাজি? আমি সবগুলোকে এখন খুন করে ফেলব। খালি হাতে আমি তোদের মুণ্ডু ছিড়ে ফেলব।"

পাহাড়ের মতো মানুষটা টিটনের চুল ধরে তাকে হেঁচকা টানে নিজের কাছে টেনে আনে, মনে হয় সত্যিই বুঝি টিটনের মাথাটা টেনে ছিড়ে ফেলবে। ঠিক তখন চঞ্চল বলল, "ভালো হবে না কিন্তু, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন ওকে।"

মানুষটা চঞ্চলের গলার স্বর শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কে কথা বলে?"

চঞ্চল বলল, "আমি।"

মানুষটা বলল, "আমি তাই ভেবেছিলাম। তুই না হলে এতো বেশি কথা আর কে বলবে? তোরে না আমি না করেছি বেশি কথা না বলার জন্যে। আমার কথা কানে যায় না?"

চঞ্চল ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আপনি ওকে ছেড়ে দেন।"

পাহাড়ের মতো মানুষটা টিটনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে ছেড়ে দিলাম। তোরে ধরলে তোর কোনো আপত্তি আছে?"

চঞ্চল বলল, "না, নাই।"

"ফড়িংয়ের বাচ্চা ফড়িং তোর সাহস তো কম না।" মানুষটা দাঁত কিড়মিড় করে চঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসে। চঞ্চল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কাছে আসতেই সে খপ করে মানুষটাকে দুই হাতে তাকে ধরল সাথে সাথে আমরা দেখতে পেলাম মানুষটা বিকট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল। তার দুই চোখে অবিশ্বাস, কী ঘটেছে সে কিছু বুঝতে পারছে না।

চঞ্চল দুই হাত সামনে বাড়িয়ে মানুষটার দিকে এগিয়ে যায় আর মানুষটা ভয়ে আতঙ্কে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চঞ্চল আবার দুই হাতে তাকে ধরে ফেলল, আর আমরা অবাক হয়ে দেখলাম এতো বড় মানুষটার সারা শরীর ঝাঁকুনি খেতে থাকে, মানুষটা থরথর করে কাঁপছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তার চোখ উল্টে গেল, মুখ হাঁ হয়ে গেল, তখন চঞ্চল তাকে ছেড়ে দিল আর সে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল, মনে হলো বিশাল একটা কোলা ব্যাঙ বুঝি লাফ দিয়েছে।

চঞ্চল আবার এগিয়ে যায়, মানুষটার দুই চোখে তখন আতঙ্ক, সে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করল, সিন্দুকটাতে তার পা লেগে যায় আর

সে প্রচণ্ড শব্দ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ে। টুনি চিৎকার করে বলল, "ধর! ধর এটাকে।"

আমরা সবাই তখন মানুষটাকে চেপে ধরলাম, সে যদি শুধু একটা ঝটকা দেয় তাহলে আমরা উড়ে যাব কিন্তু মানুষটা আর সাহস করল না, চঞ্চল ঠিক তার পিঠের উপর বসে বলল, "যদি আপনি একটু নড়াচড়া করেন তাহলে ইলেকট্রিক শক দিয়ে আমি আপনার বারোটা বাজিয়ে দিব। দেড় ভোল্টের ব্যাটারির জায়গায় আমি নয় ভোল্টের ব্যাটারি লাগিয়েছি, আপনার হার্টটাকে আমি থামিয়ে দিতে পারব।"

মানুষটা নাড়াচাড়া করল না। টুনি প্রথমে তার কোমরে গুজে রাখা রিভলবারটা বের করে নিল। আমি ছুটে গিয়ে ব্যাগ থেকে নাইলনের দড়ি বের করলাম তারপর দুই হাত পেছনে এনে শক্ত করে বাঁধলাম। টুনি দেখল ঠিক করে বাঁধা হয়েছে কিনা, তারপর বাড়তি দড়ি দিয়ে আমরা পা দুটি বেঁধে ফেললাম।

চঞ্চল বলল, "আমি যে জিনিসটা দিয়েছি সেইটার নাম ইনডাকশান কয়েল। আমার নিজের হাতে তৈরি করা। এর মাঝে আছে প্রাইমারী কয়েল আর সেকেন্ডারী কয়েল। প্রাইমারী কয়েলের জন্যে ব্যবহার করেছি সতেরো গেজের তার। দুই লেয়ার। সেকন্ডারী কয়েল চল্লিশ গেজ। বিশ লেয়ার। শক দেওয়ার জন্যে কানেকশন দিতে হয় কাটতে হয়। সেই জন্যে আছে ভাইব্রেটর। শব্দ শুনছেন?"

ইলেকট্রিক শক খেয়ে এই মানুষটা যতটুকু কাবু হয়েছিল চঞ্চলের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনে তার থেকে বেশি কাবু হয়ে যন্ত্রণায় শব্দ করতে লাগল।

আমি বললাম, "ছেড়ে দে। অনেক হয়েছে।"

চঞ্চল বলল, "বিগ ব্যাংক নিয়ে একটু বলি।"

"থাক। আর কষ্ট দিস না।"

চঞ্চল তখন পাহাড়ের মত মানুষটাকে ছেড়ে দিল।

টুনি বলল, "এবারে চোখ দুটি বেঁধে ফেল।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন।"

"এই মানুষটাকে বিশ্বাস নাই, চোখ বাঁধা থাকলে নাড়াচাড়া করার সাহস পাবে না।"

আমরা তখন তার চোখও বেঁধে ফেললাম।

ঘরের আর এক কোণায় মানিক উপুড় হয়ে পড়েছিল, আর নাক থেকে

রক্ত বের হচ্ছে, কেমন যেন ঘিনঘিনে চেহারা, দেখে ঘেন্না লাগে। টুনি বলল, "এটাকে নিয়ে কোনো ভয় নাই, কিন্তু এটাকেও বেঁধে ফেলি।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।" তারপর তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললাম। আমাদের কাজ আপাতত শেষ।

আমরা ঘরটার দিকে তাকালাম, "সিন্দুকের উপর বাচ্চা মেয়েটার কঙ্কাল নিঃশব্দে শুয়ে আছে। দেখে মনে হলো মেয়েটি বুঝি পুরো দৃশ্যটি নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

আমি বললাম, "আয় সবাই যাই।"

পাহাড়ের মতো মানুষটা বলল, "কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

আমি বললাম, "তোমার কী মনে হয়?"

"প্লীজ পুলিশকে খবর দিও না। প্লীজ! প্লীজ!"

"সেটা দেখা যাবে। আপতত তোমরা শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নাও।"

সিন্দুকের উপর তালার চাবিটা রাখা ছিল আমরা সেটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দরজা বন্ধ করে বিশাল তালাটা ঘটাং করে লাগিয়ে দিলাম।

আমরা তখন প্রথমবার একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। আমি মিথিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, "মিথিলা থ্যাংকু। তুই যদি লাফ দিয়ে মানিকের হাতটা না ধরতি তাহলে মনে হয় আমাকে গুলি করে মেরেই ফেলত!"

মিথিলা বলল, "কতো বড় সাহস! টুনি আপু উচিত শিক্ষা দিয়েছে! তাই না টুনি আপু?"

আমরা সবাই মাথা নাড়লাম, আমি বললাম, "অসাধারণ ফাইট!"

চঞ্চল বলল, "তুই তো কখনো বলিস নি তুই ফোর্থ ডিগ্রী ব্ল্যাক বেল্ট! কী সাংঘাতিক!" [www.MurchOna.org]

"তোরা কি আমাকে বলার চান্স দিয়েছিস? সব সময় আমাকে সরিয়ে রেখেছিস। তোদের ধারণা শুধু তোরাই সব কিছু পারিস আমরা কিছু পারি না।"

অনু বলল, "আর সরিয়ে রাখব না। এখন থেকে আমরা সবাই ব্ল্যাক ড্রাগন।"

আমরা মাথা নাড়ালাম, বললাম, "হ্যাঁ। ব্ল্যাক ড্রাগন।"

মিথিলা বলল, "কিংবা কালা গুইসাপ।"

আমরা সবাই হি হি করে হাসলাম, কালা গুইসাপ কথাটিকেও এখন খুব খারাপ শোনাচ্ছে না।

চঞ্চল বলল, "একদিনের জন্য অনেক এডভেঞ্চার হয়েছে। চল যাই।"

আমি বললাম, "চল।"

আমরা সেই সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়িটার দিকে এগোতে থাকি। হঠাৎ করে টুনি থেমে গিয়ে বলল, "ওটা কিসের শব্দ?"

আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং শুনতে পেলাম সত্যিই দুমদুম করে একটা চাপা শব্দ হচ্ছে।

অনু বলল, "এখানে এতো ধুলা কেন?"

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম সত্যিই সুড়ঙ্গের মাঝে ধুলো উড়ছে। হঠাৎ করে আমার একটা জিনিস মনে হলো, সাথে সাথে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি বললাম, "সর্বনাশ!"

"কী হয়েছে?"

"মনে নাই তোদের বলেছিলাম মিশকাত মঞ্জিল ভেঙ্গে ফেলবে?"

"হ্যাঁ।"

"মনে হয় ভেঙ্গে ফেলার কাজ শুরু করেছে।"

চঞ্চল বলল, "আমাদের তাড়াতাড়ি বের হতে হবে।"

"হ্যাঁ। খুব তাড়াতাড়ি।"

আমরা ছুটতে ছুটতে সিঁড়ির কাছে এসে হতবাক হয়ে যাই। পুরো সিঁড়িটা ভাঙ্গা ইট-সিমেন্ট-সুড়কি দিয়ে বোঝাই। উপর থেকে দালানটা ভাঙ্গতে শুরু করেছে আর আমাদের বের হওয়ার রাস্তাটা বুজে গেছে। এখান থেকে এখন বের হওয়ার কোনো উপায় নেই!

আমরা অনেক উপরে চাপা দুমদুম শব্দ শুনতে পেলাম। অনেক মানুষ মিলে পুরো বিল্ডিংটা ভেঙ্গে ফেলছে আর আমরা তার ভিতরে আটকা পড়ে গেছি।

মিথিলা চিৎকার করে বলল, "বন্ধ কর! বন্ধ কর!" কেউ তার কথা শুনল না, কেউ কিছু বন্ধ করল না।

তারপর আমরা সবাই মিলে চিৎকার করলাম, আমাদের চিৎকার সুড়ঙ্গের মাঝে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কিন্তু বাইরের কেউ শুনতে পেল না। তারা দুম দুম শব্দ করে ভাঙ্গতেই থাকল।

আমি দেখলাম মিথিলার চোখে মুখে ভয়াবহ আতঙ্ক। আমার নিজের জন্যে না– মিথিলার জন্যে হঠাৎ মায়া হতে থাকে।

টুনি ফিসফিস করে বলল, "আমরা খুব বড় বিপদে পড়ে গেছি।"

কেউ কোনো কথা বলল না।

৯.

আমরা সুড়ঙ্গের দেয়ালে হেলান দিয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। বাতাসে ধুলা উড়ছে। আমাদের চোখে মুখে চুলে ধুলার একটা আস্তরণ পড়ছে। টর্চ লাইটের আলোতে সবাইকে কেমন জানি অপরিচিত মানুষের মতো দেখাচ্ছে। ভয় পেলে মানুষের চেহারা মনে হয় পাল্টে যায়।

টুনি বলল, "আমাদের মাথাটা খুব ঠাণ্ডা রাখতে হবে।"

চঞ্চল বলল, "হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।"

টুনি বলল, "খুব বড় যখন বিপদ হয় তখন কী করতে হয় জানিস?"

"কী?"

"প্রথমে দেখতে সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে। তারপর সেটাকে মেনে নিতে হয়। তারপর চেষ্টা করতে হয় তার থেকে কতটুকু ভালো করা যায়।"

টিটন মুখ শক্ত করে বলল, "সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে শুনতে চাস?"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "কী?"

"আমরা সবাই এখানে আটকা পড়ে থাকব, না খেয়ে মরে ভূত হয়ে যাব। কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না আমরা কোথায় গেছি।"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমাদের অবস্থা এতো খারাপ হবে না।"

টিটন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "কেন হবে না?"

"আমাদের কাছে অনেক খাবার আছে। আমরা আরো এক-দুই দিন সেই খাবার খেয়ে থাকতে পারব। কাজেই আমাদের হাতে কয়েকদিন সময় আছে। আমাদের কাছে দুইটা মোবাইল টেলিফোন আছে। মাটির নিচে বলে সেই মোবাইল বাইরে যাচ্ছে না। আমরা যদি সিঁড়ির উপরের ইট, পাথর সরিয়ে ছোট একটা গর্তও করতে পারি তাহলেই মোবাইলের লাইন পেয়ে যাব।"

টিটন জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে গর্ত করবি? সবাই মিলে বিল্ডিংটা ভাঙ্গছে না?"

"রাতেরবেলা নিশ্চয়ই বন্ধ করবে। তখন আমরা কাজ শুরু করব।"

অনু বলল, "আমাদের কাছে একটা কবুতরও আছে। যদি ছোট একটা

গর্ত করতে পারি তাহলে সেই কবুতরের পায়ে একটা মেসেজ লিখে সেই গর্ত দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি!"

মিথিলা সিঁড়ির উপর জমে থাকা ইট কংক্রীটের বিশাল স্তূপের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ওখান দিয়ে কেমন করে গর্ত করবে? গর্ত করার জন্যে একটা হাতি লাগবে।"

আমি বললাম, "আমাদের একটা হাতিও আছে। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছি। তার হাতে শাবলটা দিয়ে বলতে পারি, একটা গর্ত করে দাও।"

এতো বিপদের মাঝেও সবাই একটু হাসল। টুনি মাথা নেড়ে বলল, "না। ঐ মানুষটা খুবই ডেঞ্জারাস। তাকে ছাড়া ঠিক হবে না। হাতে শাবল তুলে দেওয়া আরো ডেঞ্জারাস! আগে আমাদের খুন করে ফেলবে, তারপর গর্ত করে বের হয়ে যাবে।"

চঞ্চল বলল, "আমি আরো একটা জিনিস চিন্তা করছি।"

"কী?"

"এই সুড়ঙ্গটা মাটির খুব বেশি নিচে না। আমরা যদি উপরের দিকে গর্ত করতে থাকি, তাহলে এক সময় নিশ্চয়ই বের হয়ে যাব। কপাল ভালো আমাদের কাছে একটা শাবল আছে।"

অনু উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "উপরে নিশ্চয়ই শক্ত মেঝে, ভেঙ্গে বের হতে পারবি না।"

চঞ্চল বলল, "এখানে হয়তো তাই। কিন্তু যদি সুড়ঙ্গটা দিয়ে আরো দূরে যাই তাহলে হতে পারে আমরা বিল্ডিংয়ের বাইরে চলে যাব। তখন উপরে গর্ত করলে সেখানে থাকবে মাটি।"

আমি বললাম, "সুড়ঙ্গগুলো দেখেছিস? এটা সোজা যায় না, সব সময়েই আঁকাবাঁকা। একটু দূর গেলে আবার ঘুরে আগের জায়গা চলে আসি।"

চঞ্চল বলল, "প্রথমে সুড়ঙ্গের একটা ম্যাপ করতে হবে। আমরা এখনো জানি না সুড়ঙ্গগুলো কোনটা কোনদিকে গেছে।"

মিথিলা হাত তুলল, "আমি একটা কথা বলি?"

টুনি বলল, "বল।"

"আমার খিদে পেয়েছে।"

হঠাৎ করে আমাদের সবারই খিদে পেয়ে গেল। আমরা সবাই মাথা নাড়লাম, বললাম, "হ্যাঁ। অনেক খিদে পেয়েছে। আয় খাই।"

টুনি তার ব্যাগ খুলল, সেখানে স্যান্ডউইচ, চীপস, আপেল আর কোল্ড

ড্রিংকস। আমরা সবাই কাড়াকাড়ি করে খেতে থাকি।

চঞ্চল দুর্বলভাবে বলল, "এখনই সব খেয়ে শেষ করে ফেলব? পরের জন্যে রাখব না?"

অনু বলল, "পরের জন্যে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা খাবারগুলো রাখব ঠিকই, ব্যাগের ভিতরে না রেখে পেটের ভিতরে।"

এতো বিপদের মাঝে থেকেও অনুর কথা শুনে সবাই একটু হাসল। তার যুক্তিটা খারাপ না, খাবারগুলো ব্যাগের মাঝে না রেখে পেটের মাঝে রাখা!

আমরা সবাই খুব সখ করে খেলাম এবং খাওয়ার পর মনে হলো আমাদের মনের বল একটু বাড়ল। চঞ্চল বলল, "এখন আমাদের সবকিছু একটু সাবধানে খরচ করতে হবে। একসাথে সবগুলো টর্চ লাইট জ্বালিয়ে কাজ নেই। একটা করে জ্বালাবি আর যদি দরকার না থাকে নিভিয়ে রাখবি।"

টুনি বলল, "হ্যাঁ। মোবাইল টেলিফোন দুইটাও এখন বন্ধ করে রাখি। মোবাইল ফোনের চার্জ একটু বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিক বলেছিস।"

"আর আমাদের সব ব্যাগ পিঠে করে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে থাকুক। পিঠে বোঝা নিয়ে হাঁটলে পরিশ্রম বেশি হবে। আমাদের শক্তি বাঁচাতে হবে।"

আমরা আবার মাথা নাড়লাম, বললাম, "গুড আইডিয়া।"

চঞ্চল বলল, "ঠিক আছে, প্রথমে তাহলে আমরা এই সুড়ঙ্গের একটা ম্যাপ তৈরি করার চেষ্টা করি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কীভাবে করবি?"

চঞ্চল তার ব্যাগ থেকে কাগজ পেন্সিল বের করল। তারপর বলল, আমরা এই জায়গাটা ধরব সেন্টার। এখান থেকে কোন সুড়ঙ্গটা কোন দিকে কতদূর গেছে সেটা বের করতে হবে।"

আমি বললাম, "সুড়ঙ্গটা সোজা নয়, আঁকাবাঁকা ঘুরে ঘুরে গেছে।"

চঞ্চল আবার তার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা কম্পাস বের করল, আমার হাতে দিয়ে বলল, "এই কম্পাসটা দিয়ে দিক ঠিক করতে হবে।"

টিটন জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে কতদূর গেছে মাপব কেমন করে?"

"কয় পা হাঁটছিস সেটা দিয়ে। যেমন দশ পা উত্তর দিকে তারপর তিন পা উত্তর-পশ্চিমে তারপর দুই পা পশ্চিমে–"

অনু বলল, "সুড়ঙ্গগুলো খুব জটিল, দেখিস কেউ যেন হারিয়ে যাস না।"

টুনি বলল, "হ্যাঁ। কেউ একা যাবি না। দুজন দুজন করে।"

"কেউ হারিয়ে গেলে জোরে চিৎকার দিবি।"

চঞ্চল বলল, "গোলকধাঁধা থেকে বের হবার একটা নিয়ম আছে? তোরা সেটা জানিস?"

টিটন জিজ্ঞেস করল, "কী নিয়ম?"

"দেয়ালের একদিক ধরে এগিয়ে যাওয়া। তাহলে ঘুরেফিরে যেখান থেকে রওনা দিয়েছিস সেখানেই ফিরে আসবি।"

অনু অবাক হয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমার কথা বিশ্বাস না হলে কাগজে এঁকে দেখ।"

চঞ্চলের বৈজ্ঞানিক কথা বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই, তাই আমরা আর কাগজে এঁকে সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম না, বিশ্বাস করে নিলাম।

কিছুক্ষণের মাঝে আমরা তিনটা দলে ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে গেলাম। চঞ্চল আর মিথিলা, অনু আর টিটন, আমি আর টুনি। কম্পাসটা চঞ্চলের কাছে, কাজেই আমরা এখন পা গুনে গুনে মোটামুটি আন্দাজ করে মেপে যাচ্ছি, পরে ঠিক করে বসিয়ে নেব। হেঁটে যেতে যেতে আমি টুনিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই এতো ভালো কারাটে কেমন করে শিখলি?"

"যখন ছোট ছিলাম তখন একদিন স্কুলে গেছি। ভোমা টাইপের একটা ছেলে আমাকে ধরে আচ্ছা মতন পিটিয়ে দিল। আমি বাসায় এসে কান্নাকাটি করে বললাম আর কোনোদিন স্কুলে যাব না! আব্বু বললেন, সেটা তো হতে পারে না। স্কুলে তো যেতে হবে। আমি রাজি হই না। তখন আব্বু বললেন, ঠিক আছে তোকে কারাটে স্কুলে ভর্তি করে দিই। এক বছর পর তুই ঐ ছেলেটাকে পিটিয়ে দিতে পারবি। তখন আমি রাজি হলাম!"

"ছেলেটাকে পিটিয়েছিলি?"

"নাহ্। শুধু একদিন সিঁড়ির নিচে চেপে ধরে নাকটা কচলে দিয়েছি। আসলে যখন বুঝতে পারি যে পিটাতে পারব তখন আর পিটাতে হয় না।"

"আজকে তো পিটাতে হলো।"

"হ্যাঁ। আজকে অন্য ব্যাপার। ভয়ানক বিপদের ব্যাপার ছিল। যদি কিছু একটা হয়ে যেতো, সর্বনাশ!"

"হয় নাই।"

"ভাগ্যিস হয় নাই।"

আমি আর টুনি কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই হিসাবে গোলমাল করে

ফেলছিলাম। তাই আবার একটু আগে থেকে শুরু করতে হচ্ছিল। এভাবে মেপে মেপে এক সময় আমরা দেখি যেখান থেকে রওনা দিয়েছি ঠিক সেই সিঁড়ির গোড়াতে চলে এসেছি। একটু দূর থেকে মনে হল কবুতরের পাখা ঝাপটানো শুনতে পাচ্ছি। কাছে এসে দেখি গোবদা সাইজের একটা গুইসাপ কবুতরের খাঁচাটা ধরে কামড়াকামড়ি করে কবুতরটা ধরার চেষ্টা করছে। আমরা হাত দিয়ে শব্দ করতেই সেটা মুখ তুলে আমাদের দেখল তারপর থপ থপ করে সরে গেল। টুনি বলল, "এটা কী?"

"গুইসাপ। কবুতরটা ধরার চেষ্টা করছে"

হঠাৎ করে আমি চমকে উঠে বললাম, "আরে!"

"কী হয়েছে?"

"সাংঘাতিক ব্যাপার।"

"কী হলো?"

"এখানে এই গুইসাপটা এসেছে, তার মানে কী বুঝতে পেরেছিস?"

"না।"

"তার মানে হচ্ছে এই সুড়ঙ্গ থেকে নিশ্চয়ই বাইরে যাওয়ার একটা গর্ত আছে, একটা ফাঁক-ফোঁকর আছে। সেই গর্ত দিয়ে গুইসাপটা ভিতরে ঢুকেছে!"

টুনির চোখ চকচক করে ওঠে। সে বলল, "ঠিক বলেছিস!"

"তার মানে আমরা যদি গুইসাপটাকে ধাওয়া করি সেটা নিশ্চয়ই সেই গর্ত দিয়ে বের হয়ে যাবে।"

টুনি বলল, "কিন্তু আমরা যে গুইসাপটাকে তাড়িয়ে দিলাম! কোন দিকে গেল?"

"এই তো এই দিকে!" গুইসাপটা যেদিকে গেছে আমরা সেদিকে একটু খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু কোনদিকে গেছে খুঁজে পেলাম না। একটু আগে যদি ব্যাপারটা মনে পড়ত তাহলে আমরা মোটোও সেটাকে এভাবে তাড়িয়ে না দিয়ে সাবধানে ধাওয়া করতাম। পিছন পিছন যেতাম।

আমি আর টুনি যখন আফসোস করছি তখন চঞ্চল আর মিথিলা ফিরে এলো, তারা একটা কাগজে সুড়ঙ্গের খানিকটা ম্যাপ তৈরি করে ফেলেছে। আমাকে আর টুনিকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, "কী হয়েছে?"

"একটা গুইসাপ!"

"গুইসাপ? এখানে?"

"হ্যাঁ।" আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "তার মানে গুইসাপের যাওয়া-

আসার একটা জায়গা আছে। সেই জায়গা দিয়ে আমরাও হয়তো যাওয়া-আসা করতে পারি।"

চঞ্চলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, বলল, "ঠিক বলেছিস?"

"কোনদিকে গেল গুইসাপটা?"

আমি দেখিয়ে বললাম, "এদিকে গিয়ে কোনদিকে যেন চলে গেছে! এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।"

মিথিলা বলল, "আবার হয়তো আসবে।"

চঞ্চল বলল, "গুইসাপ হচ্ছে সরীসৃপ জাতীয়। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম। মনে রেখে আবার এখানে আসার বুদ্ধিই হয়তো নাই।"

টুনি বলল, কবুতরটা ধরতে এসেছিল, খাঁচা থেকে বের করে কবুতরটার পা বেঁধে রেখে দিই। হয়তো আবার আসবে।

চঞ্চল বলল, "দেখি চেষ্টা করে!"

কাজেই আমরা প্রথমে অনু আর টিটনের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর কবুতরটাকে বের করে তার পা চিকন দড়ি দিয়ে খাঁচার সাথে বেঁধে রাখলাম। কবুতরটা একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারে কিন্তু সরে যেতে পারে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার হলে আমরা কিছু দেখতে পাব না তাই খানিকটা দূরে ছোট একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমরা বেশ দূরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

চুপচাপ বসে থাকা খুব কঠিন। আমরা যদি পুরোপুরি নিশ্চিত হতাম যে আসলেই গুইসাপটা ফিরে আসবে তাহলে অপেক্ষা করা অনেক সহজ হতো। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি না তাই বুঝতে পারছি না চুপচাপ বসে থেকে আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি কী না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর টিটন ফিসফিস করে বলল, "মনে হয় আর আসবে না।"

অনু বলল, "আমারও মনে হয় আসবে না। সময় কাটছে না, আয় বাকী স্যান্ডউইচ গুলি খাই।"

আমি অনুকে ধমক দিয়ে বললাম, "সারাক্ষণ খালি খাই খাই করবি না।"

টুনি বলল, "আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপরেও যদি না আসে তাহলে আমরা নিজেরাই খোঁজা শুরু করব।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হয় চোখে একটু ঘুমের মতো চলে এসেছিল, হঠাৎ শুনলাম টুনি ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলল, "স-স-স-স..."

সাথে সাথে আমি পুরোপুরি জেগে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম একটু দূর থেকে ছায়ার মতো কিছু একটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। ছায়াটা আস্তে আস্তে একটু স্পষ্ট হলো। আমরা দেখলাম বেশ বড়সড়ো গোবদা সাইজের একটা গুইসাপ–একটু আগে এটাকেই আমি আর টুনি দেখেছিলাম! আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি তখন দেখলাম পিছন থেকে আরো একটা গুইসাপ আসছে–এটা আগেরটা থেকে সাইজে একটু ছোট। অনু ফিসফিস করে বলল, "একা আসে নাই। গার্ল ফ্রেন্ডকে নিয়ে এসেছে।"

টুনি হাসি চেপে বলল, "হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "চল এখন ধাওয়া দিই।"

চঞ্চল বলল, "চল।"

"দুইটা যদি দুই দিকে যায়?"

"তাহলে আমরাও দুই দলে ভাগ হয়ে যাব।"

আমরা মাথা নাড়লাম, বললাম, "ঠিক আছে।"

চঞ্চল তখন তার টর্চ লাইটটা জ্বালিয়ে সেটা গুইসাপের উপর ফেলল। টর্চ লাইটের তীব্র আলোতে গুইসাপটা মনে হয় একটু হকচকিয়ে গেল, তারপর ঘুরে গিয়ে সেটা থপ থপ করে দৌড়াতে শুরু করে। পিছনের গার্ল ফ্রেন্ড গুইসাপটাও ঘুরে যায়–সেটাও ছুটতে থাকে। আমরা হই হই করে তখন গুইসাপ দুইটাকে তাড়া করি।

গুইসাপ দুটি প্রথমে সোজা সামনের দিকে গেল তারপর ডান দিকে ঘুরে গেল তারপর আবার সোজা আবার ডানদিকে। তারপর একজায়গায় এসে হঠাৎ করে বামদিকে ঘুরে লাফিয়ে উঠল। দেখলাম হাঁচড়-পাঁচড় করে কোথায় জানি ঢুকে এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথমে ছোট গুইসাপটা তারপরে বড় গুইসাপটা। গুইসাপটার পিছু পিছু আমরা সেই জায়গাটাতে হাজির হলাম, দেখলাম দেয়ালে ছোট একটা গর্ত এই গর্ত দিয়েই গুইসাপ দুটি বের হয়ে গেছে।

আমরা জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করলাম, চঞ্চল দেয়ালটাকে হাত বুলিয়ে কী যেন দেখে চমকে উঠে বলল, "কী আশ্চর্য!"

"কী হয়েছে?"

"এটা একটা গেট!"

"গেট?"

হ্যাঁ। এই দেখ। মাটি আর শ্যাওলা পড়ে পড়ে ঢেকে গেছে। কিন্তু আসলে এটা কাঠের গেট। কাঠ পচে ছোট গর্ত হয়েছে।"

আমরা এসে পরীক্ষা করে দেখি চঞ্চল ঠিকই বলেছে। সত্যিই এটা একটা গেট! মাটি, শ্যাওলা সরিয়ে আমরা গেটের কড়াগুলো খুঁজে পেলাম, সেখানে একটা জংধরা তালা ঝুলছে। টুনি বলল, "মিথিলা, এইটার চাবি কী তোর কাছে আছে?"

মিথিলা বলল, "না টুনি আপু। নাই।"

আমি বললাম, "না থাকলেও ক্ষতি নাই। এই তালাটা জং ধরে একেবারে ক্ষয়ে গেছে। শাবল দিয়ে জোরে দুইটা বাড়ি দিলে ভেঙ্গে যাবে।"

"চল, তাহলে শাবলটা নিয়ে আসি।"

"শুধু শাবল না–আমাদের ব্যাগগুলোও নিয়ে আসি। মনে হয় এদিক দিয়ে বের হওয়া যাবে।"

টুনি বলল, "সবার যাওয়ার দরকার নাই। দুইজন এখানে থাক। অন্যরা যাই।"

টুনি আর মিথিলাকে রেখে আমরা আমাদের ব্যাগ আর শাবল নিয়ে ফিরে এলাম। শাবলটা দিয়ে তালাটায় জোরে একটা ঘা দিতেই সেটা খুলে গেল। গেটটা বহু বছর খোলা হয় নি তাই সেটা খুলতে চাইল না। আমরা শাবল দিয়ে চাপ দিয়ে কষ্ট করে পাল্লাগুলো একটু ফাঁক করলাম। ঘরটার মাটি–শাবল দিয়ে সেখানে কয়েকটা ঘা দিতেই মাটির চাঙ্গর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল, আর আমরা বাইরের আলো দেখতে পেলাম, সাথে সাথে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠি! আমরা সত্যি সত্যি বের হয়ে আসতে পেরেছি।

শাবল দিয়ে মাটিগুলো সরিয়ে আমরা একজন একজন করে বের হয়ে আসি, বাইরে সূর্যের আলোতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল বলে প্রথম কয়েক সেকেন্ড আমরা কিছু দেখতে পারলাম না। একটু পরে যখন চোখ সয়ে এলো তখন আমরা অবাক হয়ে দেখলাম দুজন বয়স্ক মানুষ আরো বেশি অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। একজন তোতলাতে তোতলাতে বলল, "তোমরা এখানে কোথা থেকে বের হয়ে এসেছ?"

টুনি বলল, "সেটা অনেক লম্বা স্টোরি।"

বয়স্ক মানুষটা বলল, "জনশ্রুতি আছে এই মিশকাত মঞ্জিলের নিচে সুড়ঙ্গের একটা নেটওয়ার্ক আছে। ডাকাতেরা ডাকাতি করে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে মিশকাত খানের সাথে দেখা করত। তোমরা কী বাই এনি চান্স সেই সুড়ঙ্গটা

খুঁজে পেয়েছ?"

আমি বললাম, "আমরা আরো অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছি।"

মানুষটা চমকে উঠল, বলল, "যক্ষের ধন?"

টুনি বলল, "তার থেকেও বেশি।"

"তার থেকে বেশি কী?"

"সেটা মনে হয় পুলিশকে বলতে হবে।"

"আমাকে বল, পুলিশকে আমিই জানাতে পারব। আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট। প্রপার্টি হ্যান্ড ওভারের জন্যে সরকারি কাজে এসেছি।"

টুনি বলল, "দুইজন মানুষ। একজন ভোঁটকা একজন শুটকা।"

চঞ্চল ব্যাগ থেকে মানিকের রিভলবারটা বের করে বলল, "এই যে এটা শুটকা মানুষের রিভলবার। তার নাম মানিক, ডাকে মাইনকা।"

ম্যাজিস্ট্রেট বলল, "রি-রি-ভলবার?"

টুনি মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। আরেকজন যে আছে সে ভোঁটকা। তার হাত পাগুলো থাম্বার মতো। তার কোনো অস্ত্র লাগে না– খালি হাতে চাপ দিয়ে যে কোনো মানুষের মাথা পুটুস করে ভেঙ্গে দিতে পারে।"

ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! ঐ রকম ডেঞ্জারাস মানুষ এখানে কী করছে? তোমরা কী করছ? তাদের রিভলবার তোমার হাতে কেন?"

টুনি বলল, "সেটা অনেক লম্বা স্টোরি।"

"ডেঞ্জারাস মানুষগুলো এখন কোথায়?"

"শুয়ে আছে?"

"শুয়ে আছে? শুয়ে আছে কেন?"

আমি বললাম, "আমরা বেঁধে রেখেছি। সেজন্যে শুয়ে আছে।"

"তোমরা ছোট ছোট বাচ্চারা এরকম মানুষকে কেমন করে বেঁধে রাখলে?"

এবারে আমরা সবাই একসাথে বললাম, "সেটা অনেক লম্বা স্টোরি।" বলেই আমরা হি হি করে হাসতে লাগলাম। কেন হাসছি বুঝতে পারছি না, কিন্তু কিছুতেই হাসি থামাতে পারি না। কী মুশকিল!

ম্যাজিস্ট্রেট মানুষটা আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। চঞ্চল চাবি দুটি ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিয়ে বলল, "ভিতরে একটা ঘরের আর সিন্দুকের চাবি। ঐ ঘরেই আমরা মানুষ দুইটাকে তালা মেরে রেখেছি।

মানুষগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনেক ভয় পাচ্ছে।"

"কেন ভয় পাবে কেন?"

"সিন্দুকের উপর ছোট একটা মেয়ের কঙ্কাল।"

ম্যাজিস্ট্রেট চমকে উঠে চিৎকার করে বলল, "কঙ্কাল?"

"হ্যাঁ। মোমবাতি শেষ হয়ে গেলে যখন ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাবে তখন মানুষ দুইটা অনেক ভয় পাবে মনে হয়।"

অনু বলল, "সিন্দুকের ভিতরে নাকী অনেক সোনাদানা। কিন্তু সাবধান। মেয়েটা যক্ষ হয়ে সেই সোনাদানা পাহারা দিচ্ছে!"

ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যে আরেকজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি, আমাদের কথা শুনছিলেন। এবারে ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোককে বললেন, "বিল্ডিং ডেমোলিশান আপাতত বন্ধ রাখি। কী বলেন?"

"হ্যাঁ। এরা যদি সত্যিই সুড়ঙ্গের নেটওয়ার্ক পেয়ে থাকে তাহলে সেটা একটা ঐতিহাসিক জিনিস হবে। মানুষ টিকেট কেটে দেখতে আসবে।"

আমরা তখন ব্যাগগুলো ঘাড়ে নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলাম। অনু তার কবুতরটা ছেড়ে দিল, সেটা ডানা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ে গেল। আমরা সেটার দিকে হাত নাড়িয়ে যখন হাঁটতে শুরু করেছি তখন ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তোমাদের সাথে আমাদের কথা শেষ হয় নাই।"

মিথিলা বলল, "কিন্তু এখন আমাদের বাসায় যেতে হবে। না হলে আম্মু চিন্তা করবে।"

"তাহলে তোমাদের বাসা কোথায় বল। তোমাদের নাম ঠিকানা টেলিফোন নম্বর—"

বাসায় আসতে একটু দেরি হলো। টেবিলে খাবার দিতে দিতে আম্মু বললেন, "স্কুল ছুটির জন্যে তোদের খেলা মনে হয় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। ধুলাবালি মেখে চেহারা কী রকম সংয়ের মতো হয়েছে দেখেছিস? খেলা একটু কমা।"

মিথিলা বলল, "আম্মু আসলে এটা খেলা না।"

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা তাহলে কী?"

"সেটা অনেক লম্বা স্টোরি!"

বলে আমি আর শিথিলা দুজনেই হি হি করে হাসতে থাকি।

১০.

সুড়ঙ্গের ভিতরের সেই ঘর থেকে মানিক আর তার ওস্তাদকে পুলিশ সেদিনই ধরে এনেছিল। দুজনেই নাকী ঘাগু আসামি, দুজনের নামেই অনেক কেস। পুলিশ নাকী অনেকদিন থেকে তাদের খুঁজছে।

সিন্দুকের উপর যে কঙ্কালটা ছিল সেটাকে সপ্তাহখানেক পরে কফিনে ভরে এনে জানাজা পড়িয়ে কবরস্থানে করব দিয়েছে। পুরো খবরটা খবরের কাগজে ও টেলিভিশনে বের হয়েছিল তাই জানাজায় অনেক মানুষ হয়েছিল। কবরটা বাঁধিয়ে দেয়া হয়েছে, মাথার কাছে লেখা আছে, "নাম পরিচয়হীন একটি দুঃখী বালিকা। মানুষের লোভ আর অবহেলায় শিকার। জন্ম-মৃত্যুর তারিখ অজানা।"

মিশকাত মঞ্জিল ভাঙ্গা আপাতত বন্ধ আছে। মামলা করে যে জিতেছে সে নাকি দোটানায় পড়ে গেছে। লোকজন তাকে বলছে মার্কেট করে সে যত টাকা আয় করবে তার থেকে বেশি আয় করবে পাবলিকদের সুড়ঙ্গ দেখিয়ে। সেখানে সুড়ঙ্গের ভিতর সিন্দুকটা আছে। ভেতরের সোনাদানা পুলিশের কাছে, সোনার অলংকারের মাঝে নাকী রক্তের শুকনো দাগ। সোনাদানা কে পাবে সেটা এখনো পরিষ্কার হয় নি, শোনা যাচ্ছে জাদুঘরে দিয়ে দেয়া হবে।

সেদিন মিশকাত মঞ্জিলের নিচে কী হয়েছিল সেটা জানার পর আমাদের আব্বু আম্মুরা প্রথমে আমাদের উপর খুব রাগ করেছিল। প্রথম প্রথম হম্বিতম্বি করে বলেছে আমাদেরকে আর কখনো ঘর থেকেই বের হতে দেবে না। কিন্তু এরকম অসাধারণ একটা সুড়ঙ্গের নেটওয়ার্ক বের করেছি, যক্ষ বের করেছি, যক্ষের ধন বের করেছি, শুটকা মানিক আর তার ভোঁটকা ওস্ত াদকে আটক করেছি কাজেই তারা খুব বেশি দিন রাগ ধরে রাখতে পারে নি।

তবে আমাদের নিজেদের ভিতরে অনেক রাগারাগি হচ্ছে। টিটন রেগেছে চঞ্চলের ওপরে তার তাবিজের ভেতর ই ইকুয়েন্স টু এম সি স্কয়ার

লিখে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে। অন্যেরা রেগেছে আমার উপর, আমি চোট্টামি করে লটারিতে সবাইকে ঠকিয়ে ব্ল্যাক ড্রাগন নামটা করে দিয়েছি সেজন্যে। ভুলটা আমারই, গল্পের ফাঁকে একদিন নিজেই বলে দিয়েছিলাম—না বললেই হত। সবাই রেগে মেগে বলছে আবার নতুন করে ক্লাবের নাম দেওয়া হবে।

কিন্তু নতুন করে নাম দেওয়া মনে হয় সহজ হবে না। রেডিও-টেলিভিশনেও এই নামটার কথা বলা হয়ে গেছে! সবাই এখন এই নামটার কথা জানে! সবাই এখন এর মেম্বার হতে চায়–বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা। তারা পুরো ঘটনাটা শুনে মহা উত্তেজিত। দিনরাত আমাদের পিছনে পিছনে ঘোরে পরের এডভেঞ্চারে তাদের নেয়ার জন্যে।

টুনি বাধ্য হয়ে এখন তাদেরকে বিকেলবেলা কারাটে শেখায়। দেখতে দেখতে আমাদের ব্ল্যাক ড্রাগনের বিশাল একটা দল হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে!

কিছু একটা হলে মিথিলা এখনো নাঁকি সুরে আম্মুকে নালিশ করে। তার নালিশ শুনে এখন আমি আর রেগে উঠি না। নালিশটা শুনতে ভালোই লাগে—কারণটা কী কে জানে!

জন্ম: ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

পাঠকনন্দিত এই লেখক ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।